হিন্দী ভাষার ধরণ-ধারণ বাংলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাক্যবিন্যাসরীতি এবং উচ্চারণপদ্ধতি এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দেয়।

উর্দ্দু হিন্দী হইতে বিভিন্ন ভাষা নয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে আসামী-ভাষা আদিতে বাংলার একটি উপভাষা ছিল। যদি দুই ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তবুও এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চয় প্রমাণ আবশ্যক। আসামী লিপিমালা বাংলারই মত।

এই সকল ভাষার মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক বলে—ইহা লইয়া একটু বিবাদ আছে। অনেকে বলেন হিন্দীই প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু হিন্দী বলিতে তাঁহারা যে সমস্ত স্থানের ভাষাকে ধরেন—তৎসম্বন্ধে একটু বিচার আবশ্যক। বিহারে কথিত হিন্দী এবং দিল্লীতে কথিত হিন্দীর মধ্যে যে তফাৎ আছে, তাহা বাংলা এবং উড়িয়াতেও নাই। এই পূরবী হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিলেই চলে। একটি বিহারের লোককে দিল্লীর লোকের ভাষা বুঝিতে বেগ পাইতে হয়। এ ভাবে বিচার করিলে হিন্দীর চেয়ে বাংলা ভাষাই অধিকসংখ্যক লোক বলে।

কত লোক কোন ভাষা বলে, কোথায় কোন্ ভাষা কথিত হয় এবং প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন কি আছে—তাহার পরিচয় নিয়ে দেওয়া হইল :—

(১) বাংলা :—(i) ৪৫,০০০,০০০

(ii) বঙ্গদেশ (দার্জ্জিলিঙ্‌ ব্যতীত), শ্রীহট্ট, মানভূম, সিংহভূম।

(iii) চণ্ডীদাসের কবিতা, খৃঃ ১৫ শতক।

(২) হিন্দী :—(i) { পূরবী—২২,০০০,০০০ ; পশ্চিমী—৪০,০০০,০০০ }

(ii) { অযোধ্যা, আগ্রা, বান্দেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ছোট নাগপুর এবং মধ্যপ্রদেশ। হিমালয় হইতে যমুনা উপত্যকা, পাঞ্জাব হইতে এলাহাবাদ। }

(iii) { মালিক মহম্মদের "পদ্মাবতী" ১৫৪০ খৃঃ
তুলসীদাস "রামায়ণ"—১৬০০ খৃঃ
সাহিত্য খৃষ্টীয়-ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ— }

(৩) মারাঠী—(i) ১৮,০০০,০০০

(ii) দাক্ষিণাত্য উপত্যকার উত্তরভাগ, পশ্চিমঘাট গিরিমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ, বেরার, নিজামের রাজ্যের কিয়দংশ, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগ।

(iii) নামদেব এবং জ্ঞানোবা (Dnyanoba) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ—

(৪) উড়িয়া—(i) ১০,০০০,০০০

(ii) উড়িষ্যা, সম্বলপুর, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কিয়দংশ, গঞ্জাম এবং ভিজাগাপটম্।

(iii) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানি অনুশাসন সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

(৫) আসামী—(i) ১,০০০,০০০

(ii) আসাম

(iii) ঐতিহাসিক রেকর্ড প্রায় ছয়শত বৎসরের পুরাতন হইবে।

শ্রীশঙ্করদেবের কবিতা ৪৫০ বৎসর আগেকার।

(৬) মৈথিলী—(i) ৩৫,০০০,০০০
(বিহারী) (প্রকৃত মৈথিলীভাষী—১০,০০০,০০০

(ii) বিহার, যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বভাগ, ছোটনাগপুরের কতক অংশ।

(iii) বিদ্যাপতি, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—

(৭) গুজরাতী—(i) ১০,০০০,০০০

(ii) গুজরাত

(iii) নরসিংহ মেহ্‌তা-খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—

বাঙালী জাতি

বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন এবং আধুনিক বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্যের আলোচনা দরকার। নৃতত্ব (Anthropology), জাতিতত্ব (Ethnology) এবং প্রাগৈতিহাসিক

ইতিহাসের (Pre-historic History) সাক্ষ্য প্রমাণ এই সম্পর্কে উপস্থাপিত করা উচিত।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি জাতি অনুসারে ভাষার একতা হইতেই হইবে, এমন নয়। কিন্তু জাতির বৈশিষ্ট্য:ধারা (racial genius) ভাষার বাক্য-বিন্যাস রীতির (Syntax) মধ্যে থাকিয়া যায়। আমেরিকার নিগ্রোয়া ইংরেজী বলে বটে, কিন্তু প্রতি বাক্যের ভিতর নিগ্রো জাতির চিন্তার ধরণ সহজেই ধরা যায়। বাঙালী জাতি সম্বন্ধেও তাই। বাঙালীরাও আর্য্যভাষা বলে, কিন্তু ভাষার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অনার্য্য-সম্ভবতার পরিচয় দেয়। একটি আর্য্যভাষা মূলত এক অনার্য্য জাতির মুখে পড়িয়া যে পরিণতি লাভ করে বাংলা ভাষার পরিণতির ইতিহাস তাই।

বাংলার তথা-কথিত উচ্চজাতি সমূহ সমগ্র লোক সংখ্যার অনুপাতে নগণ্য বলিলেই হয়; যদিও ইহাঁরাই দেশের মস্তিষ্ক স্বরূপ (intelligentia) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থের সংখ্যা শত করা ১৩ জন মাত্র। ইহার মধ্যে কায়স্থদের বিষয়ে একটু গোলমাল আছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ কতকটা শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন হইলেই নীচুকায়স্থের দলে মিশিয়া যায়। "অস্পৃশ্য' জাতি (untouchables) যাহাদিগকে বলা হয়, তাহারাই লোক সংখ্যায় অধিকাংশ। শতকরা ৫৬ জন এই দলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ ব্যতীত আর কেহই আর্য্য বংশজাত বলিয়া দাবী করে না। অর্থাৎ শতকরা ৮৭জন নিজেদের আর্য্য বলে না, কিম্বা বলিলেও তাহাদের আর্য্যত্ব স্বীকৃত হয় না। কায়স্থদিগকে [illegible]তো এখনও সৎশূদ্র বলা হয়। প্রাচীনকালে উচ্চ জাতিগণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ খুবই চলিয়াছিল এখনও বৈদ্য এবং কায়স্থের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বিবাহ প্রথা চলিত আছে। নিম্নশ্রেণীর সহিত অবৈধ রক্ত সংমিশ্রণ এখনও সমাজে যথেষ্ট চলিয়া থাকে। আর্য্য বংশের ধুরন্ধর বাংলার ব্রাহ্মণকেও খাঁটি ব্রাহ্মণ বলিয়া অন্যদেশের ব্রাহ্মণেরা মানেন না।

বাংলার মুসলমান অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ হইতে শেষ অবস্থায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্যবংশ সম্ভূত মুসলমান কিছু কিছু পরবর্ত্তীকালে এদেশে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটি ধরিলে বাংলাদেশে আর্য্য-সভ্যতার ধারা আসিলেও আর্য্যরক্তসম্ভূত বিশেষ কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্য হইতেও বাংলীর অনার্য্য-সম্ভবতা প্রমাণ হয়। বাংলা-বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতি অনার্য্য-ভাষার অনুযায়ী নয়। দ্রাবিড়, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং অন্যান্য

অনার্য্য-ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় রহিয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ভাষা এই সমস্ত শব্দে পূর্ণ।

বহির্ভারত (farther India), দক্ষিণভারত এবং সিংহল দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপন এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেই সব দেশের সভ্যতার নিদর্শন হইতে বাঙ্গালীর ইতিহাস উদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস নামক ইংরেজী পুস্তকে এ সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। জাতিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য হইতেও বাঙালীর অনার্য্যত্বের প্রমাণ মিলে। বাংলার ধর্ম্ম-সাধনা, দৈনন্দিন রীতিনীতি এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতর দ্রাবিড় মঙ্গোলীয় সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়।

বাঙ্গলা ভাষা

আদিম ইন্দো-আর্য্যভাষা যুগযুগান্তরের রূপান্তরের মধ্য দিয়া আমাদিগের আর্য্য-চলিত ভাষাগুলিকে দান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা শুধু বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে বিশিষ্টভাবে আলোচনা করিব।

ভাষাতত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইন্দো-আর্য্য-ভাষা অবাধ-সহজ পরিণতিতে যে আকার ধারণ করিত, বাংলার সে আকার নয়। পরিণতির মুখে এমন কিছু প্রভাব কার্য্য করিয়াছে যাহাতে ইহার বিকাশ-ধারা ভিন্ন পথে গমন করিয়াছে এবং ইহাকে অন্যরূপ দিয়াছে। মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বাঙালীজাতির অনার্য্যত্ব যে ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহা বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজী আর্য্যভাষা হইয়াও অনার্য্য আমেরিকান নিগ্রোর মুখে কিরূপ আকার পাইয়াছে। বাংলাও সেইরূপ ইন্দো-আর্য্যভাষা হইলেও মূলতঃ অনার্য্য এক জাতির মুখে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

এই দিক হইতে বিচার করিলে বাংলাভাষা মোটেই আধুনিক নয়। ইহার কতকগুলি বাক্যগঠন-প্রণালী (constructions) এবং আটপৌরে শব্দ সুদূর অতীত হইতে চলিয়া আসিতেছে। পালি, প্রাকৃতের মধ্যেও অনুরূপ প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল ভাষা হইতে আবার অনেক শব্দ কালক্রমে সংস্কৃত আকার ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃত অথবা নাটকে ব্যবহৃত কৃত্রিমতাপূর্ণ প্রাকৃত ভাষাসমূহ হইতে বাংলা

ভাষার উৎপত্তি খুঁজিলে হইবে না। পানিণি যেমন সংস্কৃত ভাষাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিয়া তাহাকে আকারের স্থিরতা প্রদান করিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সেইরূপ প্রাকৃত ভাষাগুলিকে করিয়াছিলেন। শিশিতে ইস্পিরিটের ভিতর একটি সুন্দর প্রাণীকে রক্ষা করিলে যে অবস্থা হয়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল—দেহটা সুন্দরভাবে রক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল।

বাংলাভাষার কতকগুলি আকার প্রকারের সহিত সাদৃশ্য প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মসমূহ হইতে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এগুলি প্রায়ই দৈবঘটনামূলক। উচ্চারণ-পদ্ধতি হইতেই কেবল আদি-যোগাযোগ প্রমাণ হয়। বাক্যবিন্যাস-রীতি (Syntax), শব্দসমূহ (Vocabulary), উচ্চারণ-পদ্ধতি (Accent), ছন্দোবন্ধ (Metre)—সমস্তগুলি একসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কোনও কৃত্রিম প্রাকৃতের সহিত হয়তো কতকগুলি বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ সাদৃশ্য থাকিতে পারে—কিন্তু শুধু এইটুকু হইলেই হইবে না। অন্যান্য বিভাগেও প্রমাণ আবশ্যক। অপভ্রংশ ভাষার ভিতর অনুসন্ধান করিলে অনেক তথ্য মিলিতে পারে—কারণ অপভ্রংশের মধ্যে তৎকালের কথিত ভাষার নিদর্শন অনেক রহিয়া গিয়াছে এবং এই কথিত ভাষা হইতেই বাংলার মূল সুরু হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত নাটক সমূহের কৃত্রিম অপভ্রংশের কথা এ স্থলে লক্ষ্য করা হইতেছে না—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

যে কথিত অপভ্রংশের বংশধর বাংলা সেই ভাষার লিখিত নিদর্শন খুব কমই আছে। সেই ভাষার স্বরূপ সংগ্রহ করিতে হইলে যে সমস্ত source আছে তাহা হইতে খুব বিচারপূর্ব্বক উপাদান গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার প্রাচীনতম অবস্থার আলোচনা করিলে আদিরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষা হইতে যেমন মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আকার নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতেছে—সেই লাইনে আমাদের অনুসন্ধানও চলিতে পারে।

পতিতার সিদ্ধি।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪৪)

শুভার মা কলতলায় কাপড় কাচিতেছিল, সরি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখুর পরিচর্য্যা করিয়া সে সেখানে আসিয়াছে। আসিয়াছে 'ঠাকুর মা' সেখানে আছে জানিয়া, তার মায়ের অন্বেষণ করিতে। 'ঠাকুরমা'কে সে রাখুর সঙ্গে মা'য়ের অভিনব সম্বন্ধের কথা শুনাইবে। উভয়েই তাহারা মধু-ঠাকুরের পক্ষপাতী ছিল। তার ছিল একটু মেয়েলি স্বভাব। মেয়েদের মাঝখানে একবার বসিতে পাইলে গল্পগুজবে এমন মগ্ন হইত যে কর্ত্তব্যের কথা একরূপ তার মনেই থাকিত না। সরি, শুভার মার সে সব গল্প বড় ভাল লাগিত। এমন কি সময়ে সময়ে উভয়েই তার মিথ্যা গল্প স্রোতে ভাসিয়া যাইত। তাহারাও আপন আপন কর্ত্তব্য ভুলিত। এই দোষের জন্য নির্ম্মলা ব্রজেন্দ্রকে বলিয়া মধুঠাকুরকে ছাড়াইয়া দিয়াছিল।

মুখচোরা রাখু শুধু নিজের কর্ত্তব্যটি করিয়া যাইত, কেহ কোনও প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে দুই একটা হাঁ হুঁ ছাড়া অনেক সময়েই বেশী কোনও উত্তর পাইত না।

আজ তাহারা উভয়েই রাখুকে নির্ম্মলার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিতে দেখিয়াছে। রাখুর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে তাহাদের বলিবার কিছু না থাকিলেও চিত্তের দুর্ব্বলতায় মধু ঠাকুরের কর্ম্মচ্যুতিতে নির্ম্মলার উপর তাহারা সন্তুষ্ট ছিল না। উভয়েই, বিশেষতঃ সরি রাখুর একটু আধটু দোষ দেখিতে পাইলেই যেন গোটা দুই নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

আজ যেন সে দোষ দেখিতে পাইবার মত হইয়াছে। তবে নির্ম্মলার নির্জ্জনালাপ শুভার ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত বুঝিয়া, শুভার মা ও সরি অনেকক্ষণ যে যার কাছে মন খুলিয়া কথা বলিবার সুবিধা পায় নাই।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক কথাতেই সরি শুভার মার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ মন রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার এই 'বাড়াবাড়ি রকমের' আত্মীয়তা প্রদর্শন শুধু যে শুভারই কল্যাণের জন্য, এটা তাহাদের বুঝিতে দিল না।

ইহার পূর্ব্বে সরি দুই একবার ঠারে ঠোরে শুভার মাকে দুই এক কথা শুনাইয়াছে। এখন বলিবার মত কথা পাইয়া বলিবার জন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে।

শুভার মা নির্ম্মলার কার্য্যগুলা প্রথমে কুভাবে গ্রহণ করে নাই, পরে কুভাবে গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু অল্পবুদ্ধি, শুভার নাকের চিন্তায় মস্তিক চাঞ্চল্যে সরির কথার কৌশলে অল্পে অল্পে সন্দেহগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

কলতলায় প্রবেশ করিয়াই সরি চলিয়া যাইবার ভান দেখাইল।

"কিরে সরি?"

"এমন কিছু নয় ঠাকুর মা!"

"তবে হম্‌কো ধম্‌কো হয়ে এলিই বা কেন, আবার ব্যস্ত হয়ে চলবিই বা কেন?"

"আমি জানতুম, এতক্ষণ তুমি কাপড় কাচা সেরে ঘরে চলে গেছ?"

"কাকে খুঁজছিস্?"

"পুরুত ঠাকুরের দিদিকে।" বলিয়াই সরি মুচকিয়া হাসিল।

"দিদি কেলো?" শুভার মাও হাসিল।

এই কথাটি শুনিয়াই নির্ম্মলা চলিয়া গিয়াছে; পাছে কোন অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয়।

সরি বলিল—"কেন, মা।"

"তোর মা আবার ও বামুনের দিদি হল কবে?"

"তা কেমন করে বলব ঠাকুর মা! তামাক জল দিতে গিয়েছিলুম। ঠাকুর বললে সরো, একবার দিদিকে ডেকে দাও। শুভাদিদি মনে করে বললুম, তার অসুখ। শুনে ঠাকুর বললে, সে নয়, গিন্নী।"

শুভার মা মুখে অসম্ভব গম্ভীরতা মাখিয়া সরির মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"ব্যাপার কি ঠাকুর মা!"

এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল সে সব প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, সে কথা স্বকর্ণে শুনিলে নির্ম্মলা মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিত না। তাহাতে তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ ছিল। আর শুভার সঙ্গে রাখুর বিবাহের কথাটা একবারেই যে শুভার কল্যাণের জন্য নয় এটা, কিছুক্ষণের কথাবার্ত্তার পরেই শুভার মা, সরি উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল।

রাখুকে বিদায় দিয়াও যখন নির্ম্মলা দেখিল ইহাদের গোপন কথোপকথনের নিবৃত্তি হয় নাই, তখন তাহাদের চমক ভাঙাইতে নীচের বারান্দা হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"লালু।"

ইহাদের চমক ভাঙিল। দুইজনকে একত্র দেখিতে পাইবার ভয়ে সরি বাহিরের দিকে চলিয়া গেল, শুভার মা চলিল, যেখান হইতে নির্ম্মলা নালুকে ডাকিয়াছে।

নিকটে আসিতেই নির্ম্মলা খাশুড়ীর মুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—"নালু কি এখনও বাড়ী আসে নি মা।"

"এসেছিল, আমি তাকে ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি।"

"বেশ করেছ মা, শুভার একটু জ্বর হয়েছে, নাকও একটু ফুলেছে। তবে আমার মনে কোনও ভয় হচ্ছে না। সাধু ব্রাহ্মণ, মনটা অসম্ভব চঞ্চল হয়ে পড়েছে, অন্যমনস্কের আঘাত, শুভার অকল্যাণ হ'তেই পারে না।"

"তাই বল মা, আইবড় মেয়ে আমি ভয়েই মরছি।"

"কতক্ষণ নালু গেছে?"

"অনেকক্ষণ ত পাঠিয়েছি। এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।"

"বোধহয় ডাক্তারবাবুকে দেখতে পায়নি।"

ঠিক এমনি সময়ে নালু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল—"কইরে নালু, ডাক্তারবাবু?"

নালু দূর হইতে শুধু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে ডাক্তারের না আসা বুঝাইতে চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে তার মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, ডাক্তার আনার কথা পুরুত মশাই কিছুতেই যেন জানিতে না পারে। সে জানে পুরুত মশাই তার পড়িবার ঘরে এখনও অবস্থিতি করিতেছে।

নির্ম্মলা সেটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—"অমন ভূতের মত ঘাড় নাড়তে হবে না, কি হয়েছে চেঁচিয়ে বল্।"

"ডাক্তার বাবু বললেন, আজ আর আসবার দরকার নেই, কাল সকালে যাব?"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"জ্বরের কথা বলেছিলি ভাই?"

"বলেছিলুম।"

নির্ম্মলা বলিল—"নাক ফোলার কথা?"

"সব বলেছি। তিনি বল্লেন, আমি ভাল ক'রে এক্জামিন ক'রে দেখেছি,

কোনও ভয় নেই। ওই অসুধ আর বার পাঁচ সাত লাগিয়ে দাও, জ্বরও যাবে, ফোলাও থাকবে না। যদি কাল সকালে পর্য্যন্ত জ্বর থাকে, আমাকে খবর দিয়ো?"

"ওপরে খাবার রেখেছি, খেয়ে পড়তে বস নালুবাবু! সারাদিন পড়া শুনা হয়নি বাবু এসে যদি শোনেন রাগ করবেন।"

পড়িবার ব্যস্ততায় না হউক, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যস্ততায় নালুবাবু উপরে চলিয়া গেল। নির্ম্মলা এই বারে খাশুড়ীকে বলিল—"তুমি মা শুভার কাছে খানিক-ক্ষণ থাক, পুঁটিকে তার কাছে রেখে এসেছি, কিছুতেই এলো না সে, তাকে জ্বালাতন না করে।"

এমনি সময়ে সরি সেখানে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দেখিল যে দুইজনে কথা কহিতেছে। তখন, কাজে যেন কতই ব্যস্ত, নিকটে আসিয়া উভয়কেই যেন লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আজ রাত্রে কি আমাদের আর কারও খাওয়া দাওয়া নেই গা।"

"তাই ত বৌমা, হতভাগা মেয়েটার ভাবনায় ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুত মশাই রয়েছেন, রাঁধুনি ত আজ আর এলো না, রাত্রে তাঁর খাবার ব্যবস্থা কি করব?"

"তিনি ত চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন!"

বিস্মিতা সরি বলিয়া উঠিল—"এই ত একটু আগে তোমাকে ডেকে দিতে বল্লেন দেখা করেই চলে গেছেন!"

শুভার মা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় গেলেন?"

"দেশে।"

"রইলেন না?"

"কই রইলেন—রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলুম! তোমরা জাননা, শুভার সম্বন্ধ উপলক্ষ ক'রে, তাঁকে মায়ের পেটের ভাই ব'লে পর্য্যন্ত সম্বন্ধ পাতিয়েছিলুম—কিছুতেই রাখতে পারলুম না।"

পুঁটি উপরে কাঁদিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে শুভার ক্ষীণকণ্ঠ সকলের কাণে গেল—"বৌদি, পুঁটী থাকছে না।"

"তুমি ওপরে যাও মা।" বলিয়া নির্ম্মলা কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

শুভার মা ও সরি যে যার মুখের পানে কিছুক্ষণ প্রাণহীনের মত চাহিয়া রহিল।

"ধিক্ তোরে সরি !"

"তুমিও ত কম বলনি ঠাকুরমা।"

(৪৫)

ইহার মধ্যে হেমচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া কখন যে রাখুকে ঘরের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা বাড়ীর ভিতরের একটি প্রাণীও জানিতে পারে নাই। হেমা শুধু রাখুকে দেখিল না, দেখিল সে সেই সঙ্গে তার প্রভুপত্নীকে। দু'জনে নির্জ্জনে, সকলকে লুকাইয়া কি যেন রহস্যালাপ করিতেছে। তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অসদ্‌বুদ্ধি চাকর উভয়ের এ নির্জন মিলনের সদুদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারিল না। পূর্ব্ব হইতেই রাখুর উপর এ হতভাগ্যের কেমন করিয়া একটা বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। এই বিদ্বেষ-বশেই, উভয়কে একঘরে দেখিবামাত্র, সে যেন তাহাদের নির্জনালাপের কথাগুলা শুনিতে পাইল। তাহাদের হাসিও তাহার কাণ দুটাকে ফাঁকি দিয়া ঘরের বাতাসে মিলাইতে পারিল না।

সে আসিয়াছিল, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, প্রভুপত্নীকে দুই এক কথা বলিতে। বলিতে চারুর তখনও পর্য্যন্ত ঘরে না ফিরিয়া আসার কথা। সুতরাং বাবুর যদি আসিতে বিলম্ব হয়, অথবা রাত্রে না আসা হয়, নির্ম্মলা যেন তার জন্য চিন্তা অথবা আহারাদির অপেক্ষা না করে।

হেমার আর নির্ম্মলার সঙ্গে সাক্ষাতের ধৈর্য্য রহিল না। পা টিপিয়া টিপিয়া এমন সন্তর্পণে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল যে, কাকপক্ষীটি পর্য্যন্ত তার আসার কথা জানিতে পারিল না।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সদর রাস্তায় পা দিয়াই সে একরূপ ছুটিল। চারুর বাড়ীর দোরের কাছে যখন সে উপস্থিত হইল, তখন ব্রজেন্দ্র, চারু আর ফিরিবে না বুঝিয়া, তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যাহা করিতে হয় করিয়া, ভবিষ্যতে যাহা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দরজার বাহিরে সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে। সম্মুখে গাড়ী, উঠিবে এমন সময় সে হেমাকে দেখিতে পাইল।

হেমার মুখের ভাব ও ব্যস্ততা এবং শীঘ্র তার ফিরিয়া আসা—দেখার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের মনটা সহসা সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে—পাছে হেমা পথের মাঝে সকলের সম্মুখেই এমন কোনও কথা বলিয়া ফেলে, যাহা সে ছাড়া আর কাহারও কর্ণগোচর হওয়া উচিত নয়, তাই একটা জিনিস ভুলিয়া আসার অছিলা করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বাড়ী হইতে তাহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাহিরের

কেহ চারু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিতে পারে। জানিতে পারিলে সেই অভাগিনীর পল্লীতে হঠাৎ এমন একটা গোলোযোগ উপস্থিত হইবে, যে জন্ম তাহার অনেকটা বিব্রত হইবার সম্ভাবনা।

উপরে ঝি নীচে বিশু—ব্রজেন্দ্র সিড়ির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তার মনে হইল, আর কিছু নয়, হেমা যা করিয়াই হউক চারুর কোনও খবর পাইয়াছে।

সে সর্ব্বনিম্ন সোপানে যেমন পা দিয়াছে, অম্‌নি ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল খবর কি ?

হেমাও প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য, ইঙ্গিতে উত্তর দিল, উপরে ঘরে চলুন।

চারুর অদর্শনে ঝি সারাদিনটা ছটফট করিয়া কাটাইয়াছে। বেলা শেষে তার প্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া মাসীর ঘরের দরজার সম্মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল। বাবু তাহাকে বাড়ীর বাহির হইয়া কাহাকেও কোন কথা বলিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। বলিয়া ছিল বলিলে তাহাকে ও বিশুকে খুনের দায়ে পড়িতে হইবে।

সে দেখিল বাবু হেমাকে সঙ্গে লইয়া আবার চারুর ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এ পুনঃপ্রবেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অর্দ্ধনিরুদ্ধ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"বাবু!"

তাহার দিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ না করিয়া শুধু বামহস্ত প্রসারণে ব্রজেন্দ্র তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিল।

সুতরাং ঝি আর কোনও কথা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল না। কিন্তু তার কৌতূহল তাহাকে সেই শূন্য ঘরের দোর জুড়িয়া বসিয়া থাকিতে দিল না।

সে উঠিল এবং বাবু ও হেমা দেখিতে না পায় এমন স্থানে দাঁড়াইয়া আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করিল। কথা সে শুনিতে পাইল না, তবে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়া দেখিতে পাইল, হাত, পা, মুখ নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া হেমা বাবুকে কি বলিতেছে, আর বাবুর মুখটা দফে দফে রাঙা হইয়া উঠিতেছে। একবার দেখিল, বাবু মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরাসের উপর আঘাত করিল। যেমনি দুজনে বাহিরে আসিবার লক্ষণ দেখাইল অমনি ঝি পলাইবার অন্য কোনও পথ না পাইয়া সিঁড়ির নীচে নামিয়া গেল।

ব্রজেন্দ্র তাহাকে ডাকিল। প্রথম ডাকে সে উত্তর দিল না। সে আর

একটা সম্বোধনের অপেক্ষা করিল এবং বাবুর সন্দেহের যতটা বাহিরে পারিল আপনাকে লইয়া গেল—লইয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

যা প্রত্যাশা করিতেছিল, আবার সে উপর হইতে বাবুর আহ্বান শুনিতে পাইল।

"ওরে বিশে, বাবু আমাকে ডাকে কেন শুনে আয় না।"

বিশুও নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত তার দোরটিতে হুঁকা হাতে বসিয়াছিল। সে সেই প্রাতঃকাল হইতে, যেখানে যেখানে চারুর সন্ধান পাইবার কথা, খুঁজিয়া হতাশায় নিরস্ত হইয়াছে। বাবুর আসার পর হইতে সেও আর বাড়ীর বাহির হইতে পায় নাই। বাবু ভয় দেখাইয়াছে, সেই ভোর হইতে চারুর নিরুদ্দেশের কথা যদি প্রতিবেশিনীগুলো শুনিতে পায় তাহা হইলে ঝির ও তার বিপদে পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঝি ইহার মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার গোপনে পরামর্শ করিয়াছে। তার চেয়ে ঝিয়ের বুদ্ধি অনেক বেশী, চারু না ফিরিলে তাহারা উভয়ে যে একটা বিপদে পড়িতে পারে, একথাও সে বিশুকে শুনাইতে ভুলে নাই।

বাবুর ক্রোধরঞ্জিত মুখ হইতে কি কথা বাহির হইবে শুনিতে সাহস না করিয়া সে বিশুকেই ব্রজেন্দ্রের কাছে পাঠাইল এবং প্রয়োজনের একটা অছিলা করিয়া, যেখান হইতে তার কথা শুনিতে না পাওয়া সম্ভব, সেইখানে চলিয়া গেল।

যখন সে অন্যদিক দিয়া উপরে উঠিল, তখন বিশু আবার নীচে চলিয়া গিয়াছে।

"আমাকে কি ডাকছিলে বাবু?"

"ডাকছিলুম—বলতে, সন্ধ্যের পর তোর দিদিমণি যদি না ফেরে, আমাকে পুলিসকে খবর দিতে হবে।"

ঝি শুধু মুখে ভীতির চিহ্ন দেখাইল, উত্তর দিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার ভীতি লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল "আমার মর্য্যাদা রাখতে হ'লে আর খবর না দিয়ে পারব না। পুলিশ এসে খুনের ভিতর তোরাও আছিস্ বলে তোদের সন্দেহ করবে।"

ঝিয়ের মুখ শাকবর্ণ হইল।

"বাবু! আমরা কি অপরাধ করেছি?"

"অপরাধ খুবই করেছিস্, যখনি সে বদমাইস বামুন এখানে ঢুকেছিল,

আমাকে খবর দেওয়া তোদের উচিত ছিল। যাক্, যা ক'রেছিস, করেছিস্। এখন যদি বাঁচতে চাস, পুলিশকে যা বল্‌তে হবে, আমি বাড়ী থেকে ফিরে এসে শিখিয়ে দেব।"

"আমাদের বাঁচাও বাবু!"

"বাঁচাতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে এজেহারে গোল ক'রে তোমরা যদি নিজের গলায় ফাঁসি দাও, আমাকে দোষী করতে পারবে না। বিশেকে আমি বলেছি, সে বল্‌বে—তুমিও বল্‌বার জন্য প্রস্তুত থাক।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র নামিতে গেল। এক সিঁড়ি নামিয়াই, মুখ ফিরাইয়া তখনও পর্য্যন্ত ভীতিগ্রস্ত ঝিকে একটু দৃঢ়তার ভাষায় শুনাইয়া বলিল—'যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাও, মরবে।"

"বাবু কি ঠাকুর মশায়ের সন্ধান পেয়েছেন?"

বজেন্দ্র একথা শুনিয়াও শুনিল না, মুখে বিরক্তির ভাব মাখিয়া ত্বরিত পদে নামিয়া গেল।

হেমা বিশুর সঙ্গে আগেই উপর হইতে চলিয়া গিয়াছে। প্রথমটা ভয়, তারপর চিন্তা, তারপর আশঙ্কা। ঝি বুঝিল ধর্ম্ম দেখাইতে গেলে সত্যই উভয়ে বিপদে পড়িবে, পুলিশ তাহাদের টানাটানি না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু যদি ধর্ম্ম না রাখে, তা হইলে? প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুই একটা কথাতেই সে তার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছে। সে বেশ্যার আবর্জনাময় গৃহে একটা সুগন্ধ কুসুম দেখিতে পাইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সে সেরূপ মূর্ত্তি দেখে নাই! যদি ধর্ম্ম দেখাতে যাই, আমি মরিব। ধর্ম্মের মাথা ত অনেক কালই খাইয়াছি, একটু নামমাত্র মাথার যা অবশেষ আছে, সেটুকু পেটে পূরিলে, আমি বাঁচিয়া যাইব, কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে"—

মনেও ঝি ব্রাহ্মণকে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। সে শিহরিয়া উঠিল

"বিশে!"

বাবুর প্রস্থানের সঙ্গেই দরজা বন্ধ করিয়া বিশু উপরেই আসিয়াছিল।

"বাবু কি তোকে কিছু বলে গেল?"

বিশু বলিল—"হাঁ।"

ঝির দ্বিতীয় প্রশ্নে বাবু কি বলিয়াছে বিশু সমস্তই ঝিকে শুনাইয়া দিল।—মাতাল চারুকে সঙ্গে লইয়া এক বামুন রাত্রির সেই ঘন দুর্য্যোগে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। আরও দু'চারদিন এ বাড়ীতে সে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছে।

"এই তাহা মিথ্যেটা তুই বল্‌বি ?"

"কি কোরবো, হামাকেত বাঁচতে হোবে।"

ঝি বুঝিল, বাঁচিতে হইলে তাহাকেও ওইরূপ একটা মিথ্যা কথা কহিতে হইবে।
হঠাৎ একটা জ্বালা তার সর্ব্বশরীরকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

"বিশু ! দোর বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে পারবি ?"

"তুমি কোথা যাবে।"

"আমি আর একবার খুঁজে আসি। পেটের দায়ে আমাদের চাকরি করতে আসা।"

"তাতো ঠিক কথা।"

"তোর মা যদি না ফেরে আমাদের এখানকার চাকরি হয়ে গেল।"

বিশু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

"আর যদি ফেরে, ফিরে শোনে বামুনকে ফাঁসাতে বাবুর কথায় পুলিসের কাছে আমরা মিথ্যা বলেছি, তাহলে শুধু এখানকার চাকরি যাবেনা, এরকম বাড়ীতে আমাদের আর কেউ ঠাঁই দেবে না।"

এই কথাতেই বিশু বুঝি ভবিষ্যতের চাকরির অবস্থা একবারে বুঝিয়া ফেলিল। এরূপ উপরি রোজকারের চাকরি আর সে কোথায় পাইবে ? সে বলিল - "যা ঝিমা, খুজে আয়।"

কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তার মস্তিষ্ক যাতনার উষ্ণতায় ক্ষণমাত্রের জন্যও তাহাকে ভাবিতে অবসর দিল না। ঝি বাহিরে চলিয়া গেল ; বিশু দ্বার বন্ধ করিল কিনা, সে ফিরিয়াও দেখিল না।

(৪৬)

যখন ব্রজেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সে দেখিল নালুর পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে ঘরে যে কেহ আছে, দূর হইতে বুঝিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, রাখুকে দেখিলেই এমন দুই চারিটি তীব্র ভাষায় আপ্যায়িত করিবে যে তাহার অসভ্য গুষ্ঠীতে দেশেও রাখু জীবনে কখন সেরূপ ভাষার আপ্যায়ন লাভ করে নাই।

কিন্তু যেই দেখা করিবার সময় আসিল অমনি তার সমস্ত সাহস সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কল্পনা রচিত মূর্ত্তির সম্মুখ হইতেও যেন অপসৃত হইয়া গেল। হেমা

সঙ্গে ছিল। সেও তীব্রদৃষ্টিতে ঘরের পানে চাহিল। বুঝিতে পারিল না ঘরে কে আছে, তবে দেখিতে পাইল ঘরের দেয়ালে একটা ছায়া যেন চলা ফেরা করিতেছে।

"বামুন ঘরে পায়চারি করছে বাবু!"

"দেখে আয়। সাবধান, সন্দেহ জাগে এমন কোনও কথা যেন তাকে ক'স্‌নি। সন্দেহ করলেই পালাবে।"

হেমা ঘরের দ্বারের কাছে যাইয়াই ফিরিল।

"আছে সে হেমা?"

"দেখতে ত পেলুম না বাবু, শুধু নালু বাবু রয়েছেন।"

সে দিক দিয়া যাইতে ব্রজেন্দ্রের আর কোনও এখন আপত্তি রহিল না। হেমাকে সঙ্গের জিনিষপত্রগুলা তার কাজের ঘরে লইতে আদেশ করিয়া সে নালুর ঘরের মধ্য দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চলিল।

সত্যই নালু বাবু তখন একখানা বই হাতে ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছিল। ব্রজেন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তার মুখ ছিল অন্যদিকে।

"ওখানে হুঁকো কেন নালু বাবু?"

পিতার আহ্বানে চমকিতের মত বালক মুখ ফিরাইল। একবার সে হুঁকার পানে চাহিল মাত্র—উত্তর দিতে পারিল না।

"মাষ্টার কি তামাক খায়?"

"না।"

"ও হুঁকো তবে কার?—আরে গেল, চুপ ক'রে রইলি কেন?"

"মাষ্টার মশাই আসেন নি।"

"তা হ'লে কে এ ঘরে ছিল?"

"পুজুরি ঠাকুর।"

"কে এ ঘরে তাকে ঢুকতে দিলে?"

নালু উত্তর দিতে পারিল না। রাগের সঙ্গে ব্রজেন্দ্র প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল। নালু উত্তর দিল না।

"কখন সে এসেছিল?"

"সকালে।"

"সমস্ত দিন ছিল!"

"মা তাঁকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

"তোমার তাহ'লে আজ পড়াশুনা হয় নি?"

"উপরে বসে পড়েছি।"

'বামুন গেল কোথা?"

নালু বলিতে পারিল না।

"আবার আসবে সে?"

নালু বলিতে পারিল না।

অনেক কষ্টে পুঁটিকে ঘুম পাড়াইয়া নির্ম্মলা সবেমাত্র রান্নাঘরের চৌকাটে পা দিয়াছে। দিনমানে স্বামীর আহারের সে যে সকল উদ্যোগ করিয়াছিল, যদি স্বামী রাত্রিতে বাড়ী আসে সে সকল সামগ্রী আর তার মুখের কাছে ধরা চলিবে না। রাঁধুনি আসে নাই, তাই শাশুড়ীকে শুভার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া নিজেই সে রাঁধিতে আসিয়াছে।

দোরে পা দিতেই সে শুনিতে পাইল, স্বামীর কথা। একবার সে কান পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাখুঠাকুর সম্বন্ধে স্বামীর চিত্তের অবস্থা সে বুঝিয়া লইল। পাছে ব্রজেন্দ্র দেখিতে পায়, তার আর কোনও কথা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

ব্রজেন্দ্র কিন্তু শঙ্কিত নিরীহ পুত্রকে আর প্রশ্নের উপর প্রশ্নে বিপদগ্রস্ত করা যুক্তি সঙ্গত মনে করিল না। "বুঝতে পারছি সারাদিন তুমি পড়ার নাম পর্য্যন্ত করতে পারনি নালুবাবু। সাবধান, এরকম পড়ায় অবহেলা আর কখন না আমাকে শুনতে হয়। মনোযোগ দিয়ে পড়, এক মাষ্টার ছাড়া অন্য যে কেউ এ ঘরে ঢুকতে আসবে, নিষেধ করবে।" বলিয়াই ব্রজেন্দ্র আবার বাহিরের সিঁড়ির পথ ধরিয়াই উপরে চলিয়া গেল।

"পুঁটি!"

ঠাকুর ঘরে শুভার মা, শুভার ঘরে সরি—উভয়েই বুঝিলেন ব্রজেন্দ্র আসিয়াছে। আসিয়াই কন্যার নামের সাহায্যে গৃহিণীকে অন্বেষণ করিতেছে।

তখন মধুঠাকুরের আসিবার সময় হইয়াছিল। সেইজন্য সে আবার সরিকে শুভার কাছে রাখিয়া আরতির আয়োজন করিতে ঠাকুর ঘরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার প্রতীক্ষার অছিলায় শুভার মা বসিয়া রহিল। চারু সম্বন্ধে ব্যাপার জানিতে যদিও তাহার বিশেষ কৌতুহল হইয়াছিল, তবুও সপত্নী পুত্রবধূর কাছে কেমন যেন একটা অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়া হঠাৎ উঠিয়া আসিতে সে সাহস করিল না।

সরিও আসিতে আসিতে কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। শুভার তন্দ্রা আসিয়াছিল। পুঁটির নামে তার চটকা ভাঙিল তীতবৎ শয্যায় বসিতে গিয়া সে সরিকে দেখিল।

"দাদা কথা কইলেন না ঝি ?"

"শুভা !"—শুভার প্রশ্নে সরির আর উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না।

"বৌদি কি ঘরে নেই ?"

"থাকলে কি তোমার দাদা অত পুঁটি, শুভা করে !"

"তবে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, যা।"

"ডাকছে তোমাকে, আমি গিয়ে কি করব !"

"মা !—আরে গেল, এরা বাড়ীতে কেউ নাই নাকি !"

শুনিয়া শুভা মুখ ঢাকিতে ঢাকিতে শুইয়া পড়িল।

"সরি !"

অগত্যা সরিকে যাইতে হইল।

নির্ম্মলাও রান্নাঘর হইতে ব্রজেন্দ্রের কথা শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, পুঁটি, শুভার নাম লইয়া স্বামী কাহাকে ডাকিতেছে।

কিন্তু সে উপরে গেল না। স্বামী এখন আর নীচে আসিতেছে না বুঝিয়া সে একবার নালুর কাছে গেল।

মাকে দেখিয়াই নালু বলিল—"মা! বাবা এসেছেন।"

"আমি জেনেছি। তিনি তোমাকে বকছিলেন কেন নালু? ভট্‌চাজ্জি মসাই এ ঘরে ছিলেন বলে? তা বোকা ছেলে, চুপ ক'রে বকুনি খেলে, আমার নাম করলে না কেন? ছি নালুবাবু, লেখাপড়া মিছে শিখেছ, সত্য কইতে তোমার এত ভয় !"

"বাবা বড় রেগে কথা কইছিলেন মা !"

"সত্যিই তোমার আজ পড়া হয়নি। ব'সে মন দিয়ে পড় নালুবাবু !"

প্রতাপের অন্তিম।

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

এখনো সূর্য্য দীপ্ত আকাশে, রক্ত গরিমা ফুটিয়া বয়,
এখনো আমি যে জাগিয়া জগতে এখনো স্বাধীন এখনো জয়।
মেবার-গিরির শিখরে শিখরে স্বাধীন সূর্য্য ফুটিয়া ওই।
আমি যে প্রতাপ আমি যে মুক্ত এখনো আমি যে বাঁচিয়া রই।
দেখতো বন্ধু চাহিয়া দেখতো আঁধার আভাষ এসেছে কিনা,
প্রাণ দিও তবু আসিতে দিওনা একটী পদও সমর বিনা।
মেবার মেবার জননী আমার এখনো তোমার জীবন বয়।
মেবার-গিরির শিখরের মত মেবার শীর্ষ গরিমাময়।

দেখা যায় ঐ জনপদগুলি ঐ যে নগর ঐ যে গ্রাম।
কল-মুখরিত হাস্ত-উজল মর্ত্ত্যের মাঝে স্বরগ ধাম।
ছিল যেথা চির উৎসব দিন শুভ সমারোহে সুখের ধারা।
সেখানে এখন বিজন কানন সে দেশ এখন শ্মশান পারা।
বাজিত যেখানে নিশিদিন ধরে' আশার রাগিণী ললিত গান,
এখন সেখানে ধ্বনিছে দিবায় শতেক শিবার বিকট তান।
আমি কি করেছি জননী আমার তোমায় এমন রিক্ত দীন
যেন ম্রিয়মাণ এমন শ্মশান মরুর মত সুষমা-হীন।

জানি আমি মাগো আমারি কারণে গিয়াছে মরিয়া দেশের বীর।
সমর-অনলে দগ্ধ মেবার দিয়াছে আহুতি সকল শ্রীর।
মরেছে মেবার, মরু একেবারে রেখেছি তবুও গরিমা মা'র,
স্বাধীন মেবার মুক্ত মেবার রেখেছি মহিমা এখনো তার।
সম্পদহীন হয়েছে মেবার বিগত বিভব সে সুখহীন।
তবুও মেবার স্বাধীন জগতে হয়নিক হীন অধীন দীন।
দেখো দেখো চেয়ে রক্তিমরাগে কি মহা মহিমা শিখরে ঝলে;
কি মহা গরিমা প্রবাহিত হয় মেবারের এই গিরির তলে।

যাবেনা সূর্য্য যাবেনা ডুবিয়া রহিবে উচ্চে মেবার গিরি,
রক্তিম রাগে অমনি দীপ্ত তেমনি হীনতা তামস চিরি।

বন্ধু আমার, চলে যাই আমি এ বুঝি আমার এসেছে শেষ ;
রহিল মেবার স্বর্গ আমার আমার ইষ্ট আমার দেশ।
এ দেব-ভূমির রাখিও শুচিতা রাখিও গর্ব্ব রাখিও মান,
মায়ের পূজায় সঁপিও অর্ঘ্য সকল সিদ্ধি সকল প্রাণ।
দিয়াছি সকলি যা কিছু কাম্য যাহা কিছু প্রিয় প্রাণের মত।
বিপদের মত বনবাসী আজি তবুও বারেক হইনি নত।
ইহজনমের স্বরগ আমার, আমার গর্ব্ব, আমার সুখ।
পুড়িতে দেখেছি পলকে পলকে বাজের আঘাতে ভেঙ্গেছে বুক।
যেথানে পূর্ব্ব পিতামহগণ রচিয়াছিলেন সুখের নীড়।
আশার আবাস পূজামন্দির আশ্রয় যত বিভবশ্রীর।
সে ভূমি এখন ত্যক্ত বিজন যায় নাকি ভেঙে আমারো হৃদি ?
দেয় নাকি ব্যথা আমারো পরাণে উৎসবময় সে সুধাস্মৃতি ?
পরাণ পুতলি কুমার কন্তা কত না দিবস ক্ষুধায় জলে
কত অনশনে কত যে ক্লিষ্ট ভেসে যায় বুক অশ্রুজলে।
তবুও বন্ধু সন্ধি মাগিনি রেখেছি অটুট মুক্তি ধন।
শুখায়ে যদিও মরিত তাহারা তবুও অটুট রহিত পণ।
কত যে দিয়াছ বন্ধু তোমরা প্রার্থনা আজি আমার শেষ,
মেবার গরিমা রাখিও রাখিও স্বাধীন রাখিও এ দেব-দেশ।
কত ব্যথা বুকে সহেছি নিয়ত হাসিতে হাসিতে বিলাস মত,
কেবল অসহ এই সে বেদনা মেবার পরের চরণে নত।
ঈশ্বর ছাড়া কারেতো জানিনা কাহারে প্রণতি করিতে আর।
কাহারে মেবার লুটাবে না শির হউক ধ্বংস সকল তার।
সকল দুঃখ বেদনা-পঙ্কে কমল শোভায় একটী সুখ,
ফুটিয়া রয়েছে জীবনে আমার স্নিগ্ধ করিয়া এ পোড়া বুক।
স্বাধীন মেবার এ মম শান্তি ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা ভেঙ্গোনা ভাই।
রহিল আমার পরম ইষ্ট যাই তবে আমি আজিকে যাই।
সন্ধি করিব কিসের সন্ধি এদেশ আমার আমারি মা।
দস্যু করিবে সে দেশ দলিত কিসের শান্তি চাহিব বা !
শান্তি মাগিয়া শৃঙ্খল পরা মৃত্যু তা চেয়ে পরম সুখ,
অত্যাচারীর অবিচার সহা তার বাড়া আর কি আছে দুখ।

রক্ত চক্ষু দেখায়ে করিবে সত্যেরে নত পাপের পায় ?—
এইতো সন্ধি ? এ চেয়ে মেবার অতলে যেন সে ডুবিয়া যায় ।—
আমারি এদেশ আমারি জননী অধিকার কিছু নাহিক কার ।
স্বপ্নেও যেন সন্ধি মাগিয়া গরিমা তুচ্ছ করোনা মা'র ।
বিদায়ের কালে কি যেন নিরাশা মরমের মাঝে ঘনায়ে আসে ।
দেখা যায় যেন দূর নভো গায় কি যেন একটী কালিমা ভাসে ।
দেখিতেছি যেন এ শুচি শুদ্ধ আত্ম মহিমা ব্রতের শেষ,
মঙ্গলময় অমৃত ছাড়ি বিলাস মদিরা মোহিত দেশ,
সাধনার পূত হোমানল নিভে জলেছে সেথানে সুখের বাতি,
মন্দির ভাঙ্গি উঠেছে প্রাসাদ দিবার অন্তে এসেছে রাতি ।
ভিক্ষা মাগিয়া লয়েছে মেবার বিনিময়ে তার মুক্তিধন ।
একটু আরাম একটু আয়াষ তুচ্ছ ভোগের আকিঞ্চন ।
মেবার গর্ব্ব ধুলায় লুটায় করিছে শত্রু অট্টহাস ।
বিলাস কলুষ পঙ্কে মগ্ন অধঃ পতিত ঘৃণিত দাস ।
দগ্ধ করিও চূর্ণ করিও ভস্ম করিও সে মহাপাপ ।
হে মহামহেশ প্রার্থনা করি দিওনা মেবারে এ অভিশাপ ।
যাই তবে আমি যাই চলে যাই বিদায় বন্ধু বিদায় দাও ।
একবার শুধু মিলিত কণ্ঠে উচ্চে মেবার মহিমা গাও ।
স্বাধীন মেবার মুক্ত মেবার দৃপ্ত বিজয়ী মেবার বীর ।
মেবার গিরির শিখরের মত মেবার গরিমা উচ্চশির ।

ঘৃণাহতা

[শ্রীভক্তেন্দ্রনাথ রক্ষিত]

প্রথম পর্ব্ব।

অরুণের কথা—

তাকে আমি কখনও ভালবাসি নি। সে ছিল আমার চোখে ঝুলের মত কাল, কাকের মত কর্কশ-কণ্ঠী, আর গলিত শবের মত ঘৃণিতা ও অস্পৃশ্যা। সে দিন হঠাৎ বাবা আমার হাত ধ'রে মুখুর্জ্জেদের বরশূন্য বিবাহ-সভায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন "মুখুর্জ্জে মশায়, আপনার জাত রক্ষার জন্য অরুণকে এনে দিলুম, যদি আপত্তি—" বাবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দুঃখের সঙ্গে আনন্দ, হাসির সঙ্গে কান্না মিশায়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বরে ব'ল্লেন, "সে কি দাদা! আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ অরুণের মত সৎপাত্রে নিরুকে অর্পণ কর্ত্তে পাল্লুম।" আমার দিকে ফিরে ব'ল্লেন, "আমার কিছু নেই বাবা; আজ যে তুমি আমার জাত রক্ষা করলে এর বিনিময়ে শুধু আমি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি "তুমি সুখী হও—রাজা হও বাবা।" কিন্তু বৃদ্ধের সে আশীর্ব্বাদ ফলে নি;—আমি জীবনে কখনও সুখী হ'তে পারি নি।

প্রথমে আমিও বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব ক'রেছিলাম এই ভেবে যে—কলেজে গিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ কত্তে পারবো; আর নিজেকে আদর্শ খাড়া করে সহাধ্যায়ী ছাত্রদের কাছে মূর্ত্তিমান্ উপদেশ হয়ে দাঁড়াতে পারবো—কেমন ক'রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাকে তা'র চিরজীবনের সঞ্চিত অন্ধকার থেকে তা'কে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর দিকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু যখন শুভ-দৃষ্টির সময় তা'র মুখ দেখ্লুম, তখন লজ্জায় ঘৃণায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে এলো! বিষের জ্বালায় প্রাণ জ্বলে উঠ্লো। মনে হ'তে লাগ্লো বাজ পড়ে যদি রাণীগঞ্জের ওই কয়লার স্তূপটাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে যায়—তা' হ'লেও বোধ হয় একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি। কিন্তু তা' তো হবার নয়—ঐ ঝুলের বোঝা যে আমার চিরজীবন মাথায় ক'রে নিয়ে ফিরতে হবে! ওগো তোমরা কি কেউ বল্‌তে পার এটা মরণের হাত ছাউনি, না বাঁচবার মলয় বাতাস। এ জীবন-মরণের মিলন,—না বিচ্ছেদ? আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি নে; এ যে স্বপ্নের চেয়ে অদ্ভুত, মরণের চেয়ে নির্ম্মম, অগ্নিশিখার চেয়ে নিষ্ঠুর।

সুখের বিনিময়ে এ যে দুঃখের বোঝা—জীবনের বিনিময়ে এ যে নিবিড় মরণ। তার পর শুন্‌বে তোমরা আমার এ দুঃখের কাহিনী? এক এক ক'রে চার বছর চলে গেল। কত আলো এসে আঁধার ছেয়ে ফেল্লে, হাসির ছটায় জগতে নূতন যুগের উদয় হ'ল; কিন্তু আমার সেই মর্ম্ম-বেদনা র'য়ে গেল, বুঝি ম'র্লেও যাবে না।

এর মধ্যে আমাদের কথাবার্ত্তা ঠিক অপরিচিত পথিকের মত হ'য়েছিল মাত্র। অথচ সে এই চার বছর ধ'রে নব বসন্তের মত ছুটে আস্‌তো আমায় আঁকড়ে ধর্ত্তে—আর আমি শুধু তা'কে বাসি ফুলের বোঝার মত দু পা দিয়ে দ'লে শান্তির জন্ত উল্কার মত ছুটে চলে যেতুম—কিন্তু কোথায় শান্তি? জগতে তো শান্তি নেই—আনন্দ নেই—উৎসাহ নেই! এ জগতটা যে পিশাচের মত নিষ্ঠুর, কমলে কণ্টকের মত অপ্রীতিকর। এখানে আছে হাসির বদলে অশ্রু, দেবতার পরিবর্ত্তে পিশাচ, আর বসন্তের পরিবর্ত্তে আছে গ্রীষ্ম আর দুরন্ত হেমন্ত!

আজ অনেক দিনের কথা! বিয়ের প্রায় দু'বছর পরে নিরুকে নিয়ে যাওয়ার জন্তে তার এক দাদা এসেছিল। রাত্রে নিরু আমায় জিজ্ঞাসা কর্লে যে সে যাবে কি না? আমি উত্তরে কর্কশ-কণ্ঠে বল্লুম—"যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" এমন সুরে কথাটা আমি তাকে বলে ছিলুম যে তার মানে হয় যেন এ বাড়ীর সে কেউ নয়। যদি এ বাড়ীর একটা বেড়ালও মরে তা' হ'লেও লোকে 'আহা' বল্‌বে—কিন্তু সে ম'র্লে নয়। অসহায়া মাতৃহারা শিশুটীর মত জল-ভারাবনত চোখ দুটি তা'র নিমেষের জন্তই আমার মুখের উপর রেখেছিল। তার পর চাবির তোড়ার শব্দ করে' সে চোখে কাপড় দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় কাঁদতে। নিমেষের সেই একটুখানি চাউনিতে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছি অনেক পদ্ম-আঁখির অর্থপূর্ণ চাউনি চোখে আমার বুলিয়ে গেছে; কিন্তু অমন চাউনি আমি কোথাও দেখি নি। নিজের সামান্ত পুঁজিটুকু বিলিয়ে দিয়ে আশ্রয়ের জন্ত আকুল আবেদনের মত সে দৃষ্টি—সে যে কত মধুর—কত সুন্দর—কত করুণ, তা' তো' তোমরা কেউ বুঝতেও পার্ব্বে না।

রাত্রি তখন ১২টা কি ১টা হবে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ চাহিতেই যা' দেখলুম—লজ্জায়, ঘৃণায়, আমার মাটীতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা হ'লো, আমার বুকের উপর একরাশ কাল চুলের বোঝা সমেত মাথাটা রেখে—দুহাত:

দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে —মাতৃক্রোড়ে ঘুমন্ত শিশুর মত নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে আছে নিরু। তা'র গায়ের রঙের সঙ্গে একরাশ মাথার চুলের রং মিশিয়ে দেখাচ্ছিল —যেন একরাশ শুভ্র ফুলের উপর আকাশ থেকে কে প্রকাণ্ড একটা ঝুলের চাপ ফেলে দিয়েছে। হারিকেনের সাদা চিমনির ভেতর অনেকখানি কালী জমে যেমন বিশ্রী দেখায়, তেমনি তা'কে আমার বুকের উপর দেখাচ্ছিল। আমার আর সহ্য হ'ল না। "মরবার আর জায়গা পাওনি" বলে' এমনি এক ঠেলা দিয়েছিলুম যে সে খাট থেকে প'ড়ে গেল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "মা-গো!" কি করুণ স্বর! কত বেদনা—কত যাতনা—কত কাতরতা মাখা। প্রাণের কতটা জ্বালা সে ওই এক "মা-গো"র মধ্যে প্রকাশ ক'ল্লে? হেনার পাগল করা গন্ধ নাচতে নাচতে এসে বলে' গেল "মা-গো"। আমি চম্‌কে উঠলুম। আমিও যে মাতৃহারা। মা যখন মারা যান তখন আমিও যে ওই রকম বেদনা জড়িত কাতর-কণ্ঠে ডেকেছিলাম "মা-গো"। এতদিন যে চাপা কান্না আমার বুকের ভেতর জমে ছিল; আজ তা' নদীর স্রোতের মত চোখ ফেটে বেরুতে লাগলো। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। নীচে যে একজন একবার কাতর শব্দ করেই চুপ কর্‌লো—সে বাঁচলো কি ম'র্লো দেখবার সময় হলো না—বুঝি দরকার বলেও মনে করি নি।

নিরুপমার কথা

মাগো মা—এ যন্ত্রণার অবসান ক'বে হবে আমার। আর যে সইতে পারি নে। নিষ্ঠুরের মত তিল তিল ক'রে আমায় মের না—একবারে মেরে ফেল। আমি মর্ব্ব—ওগো মৃত্যুর দেবতা—আমায় মরণ দাও প্রভু। তোমরা হাসছো, বলছো "গরীবের মেয়ে ছিলে খেতে পেতিস্‌নে এখন রাজ সুখে আছিস্ পরতে পেতিস নে, এখন দু'বেলায় চার খানা ঢাকাই শাড়ী পচ্ছিস্—তবু মর্ত্তে চাস্, কি বোকা"। সত্যিই আমি বোকা নইলে এমন দেবতার মত শ্বশুর ছেড়ে মর্ত্তে চাচ্ছি? বাবা আমায় কত বোঝাতেন, কত উপদেশ দিতেন, কিন্তু পোড়া মন আমার বুঝ্‌তোনা। যদি কখন 'তিনি' একবার নিরু বলে ডাক্‌তেন—তা'হ'লে বুঝি আজ এমন করে' মরণকে ডাকতুম না। ভগবান কেন আমায় সে অমৃতের অধিকারিণী ক'রে পাঠাওনি—যা'তে স্বামীর তৃপ্তি দিতে পারি?

একদিন কথায় কথায় বাবাকে বলে ফেলেছিলুম—"মেয়ে মানুষের রূপ না থাকলে তা'র কোন কদরই থাকে না।" বাবা একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্লেন "জানি মা! আমার একটু অসাবধানতার ফলে তোমাদের জীবন যে কতটা অশান্তিময় হ'য়ে উঠেছে তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু কি কর্ব্বো মা, আর তো উপায় নেই। এমন সোনার প্রতিমাকে যে কেউ অনাদর কর্ত্তে পারে এটা তখন ভেবে দেখিনি। তখন ভেবেছিলাম নারীর রূপ অরুণ বাইরের চামড়ায় খুঁজবে না—খুঁজ্‌বে হৃদয়ে।" তার পর এমন সব কথা বলতে আরম্ভ কল্লেন যে আমার বড় লজ্জা কর্ত্তে লাগ্‌লো। যেন তিনি আমার কাছে কত অপরাধী শেষে আর তাঁকে থামাতে না পেরে বল্লুম—"আপনি আমায় প্রায়ই পড়তে বলেন আজ থেকে পড়'ব।" সেদিন থেকে নূতন উৎসাহে আমি আবার পড়তে আরম্ভ করেছি—আর তারই ফলে আমার এই ছেঁড়া "ডাইরির" পাতা ক'খানা থেকে তোমরা আজ আমার দুঃখের কাহিনী জান্‌তে পাচ্ছো। হয় তো তোমরা বলবে হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর বৌ, তা'র আবার "ডায়রি" কি। এবাতিক কেন? স্বামী সোহাগে গরবিনী সৌভাগ্যবতী তোমরা তোমাদের না থাকতে পারে—কিন্তু আমার আছে। তোমাদের সঙ্গী আছে; কিন্তু আমার সঙ্গী কে জান? এক বৃদ্ধ শ্বশুর আর এই প্রাণের সাথী মরণের সাথী আমার "ডায়রি।" এব্যথা তো শ্বশুরকে জানাবার নয়—তাই আমার এই ছোট সঙ্গীটাকে চুমুর উপর চুমু দিয়ে প্রাণের ব্যথা জানাই।

• • • • •

সেদিন ছিল শনিবার শুনলুম স্বামীর কোথায় নিমন্ত্রণ আছে আস্‌তে দেরি হ'বে। আমায় কিছু না বল্লেও যখন তিনি বড়জাকে ডেকে বল্লেন—"বৌদি, আজ আস্‌তে দেরি হ'বে নিমন্ত্রণ আছে। দয়া করে কেউ দরজাটা খুলে দিও।" তখনি বুঝলুম আজ আবার এই খোঁড়া পা নিয়ে সেই একতলায় নাবতে হ'বে দরজা খুলতে। আমার দু'চোখ ফেটে জল এলো। এই যে কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি ক'রে পড়েছি জানি না। পড়ে কপাল ফেটেছি পা ভেঙেছি —কেউ কি খবর নিয়েছে? যখন জ্ঞান হ'লো তখন দেখলুম বাবা নিজে বাতাস কচ্ছেন। মহেশ ডাক্তার চেয়ারের উপর ব'সে। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিতে যা'বো—সবাই বারণ কল্লেন। একটু পরে ডাক্তারের সঙ্গে বাবা চলে গেলেন—একটা পরিস্কার বিছানায় মায়ের মত যত্ন করে শুইয়ে রেখে। স্বামী কতবার ঘরে এসেছেন কিন্তু একবারো জিজ্ঞাসা করেন নি আমার কি

হ'য়েছে। এসব কথা মনে করে 'আমি কাঁদ্‌চি এমন সময় বাবা এসে পড়লেন —বল্লেন—' কাঁদছো কেন মা? বড় যন্ত্রণা হচ্ছে কি?" আমি ছোট মেয়েটীর মত কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সব কথা তাঁকে বল্লুম। বাবা বল্লেন "তা'র জন্যে কান্না কেন মা? কেউ দরজা না খুলে দেয় আমি দেবো। আজ তোমায় রামায়ণ শোনাব—অরু এ'লে আমি দরজা খুলে দেবো।"

* * * * * *

সে দিন রাত্রে কে তাকে দরজা খুলে দিয়েছে জানি না। যখন তিনি ঘরে এলেন তথনও বাবা সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছেন—আর আমি বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে শুন্‌ছি। ঘরে এসেই বাবাকে বল্লেন, "এত রাত পর্য্যন্ত হিম লাগাচ্ছেন কেন?" বাবা বল্লেন "বৌমা একা, তাই একটু রামায়ণ শোনাচ্ছিলুম কটা বেজেছে?" ঘড়ি দেখে তিনি বল্লেন "১২টা বেজেছে।" বাবা বল্লেন "আজ এই পর্য্যন্ত থাক মা, কাল আফিস থেকে এসে আবার শোনাবো।" এখানে ব'লে রাখি এ বাড়ীর কেউ চাকরি করে না, হাটখোলায় আমাদের পাটের আফিস আছে বাবা সেটারই দেখা শোনা করেন। বাবা চলে যেতেই স্বামী আমার উপর কটূক্তি বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। এই শীতের রাত্রে বুড়ো শ্বশুরকে হিমে বসিয়ে রেখে নিজে দিব্বি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি তার পর আজ না কি আমি বড় জাকে যাচ্ছে তাই অপমান করেছি—দাদা দেশে নইলে আজই নাকি বড়জা বাপের বাড়ী চলে যেতেন। আমি আর থাকতে না পেরে বল্লুম "আজ সমস্ত দিন ত বড়দির সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।"

আগুনে ঘি পড়লে যেমন হয় তেমনি চীৎকার করে তিনি বল্লেন "তুমি বলতে চাও বড় বৌদি মিথ্যে কথা বলেছেন—এত আস্পর্দ্ধা তোমার।" বলে গোলার মত ছুটে এসে আমার বুকে সজোরে লাথি মেরে বল্লেন—"জান কে আমায় পাঁচ বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছে—খবরদার যদি কখন আর তাঁকে অপমান কর্ত্তে শুনি তো মনে থাকে যেন এই লাথির কথা।" বলে আবার আর এক ঘা। ওগো দোহাই তোমাদের—আমার মাথা খাও—কেউ তাঁকে কিছু বলোনা। তিনি যে তোমাদের অনেকের স্বামীর চেয়ে লেখা পড়া বেশী জানেন। তিনি যে এম্‌, এ পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। সুতরাং ওগো কিছু ব'লো না—কিছু ব'লো না।

* * * *

অরুণের কথা

কাল ছিল শনিবার দিব্বি ফুর্ত্তি ক'রে বাড়ী ফিরলুম—রাত্রি তখন ১২টা। এসেই শুনলুম বৌদির মুখে নিরু নাকি তাঁকে যাচ্ছে তাই অপমান ক'রেছে। রাগে আমার মাথার চুলগুলো সব খাড়া হ'য়ে উঠলো। এই বৌদিটী আমায় ছেলের মত ভালবাসতেন। যখন আমি পাঁচ বছরের তখন মা মারা যান; আর সেই থেকে এই স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া আমায় কখন মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। বৌদিদি যখন কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লেন "অরু তোর বৌ আজ আমায় অপমান কল্লে এতদিন ধরে তোকে মানুষ কল্লুম তা'র এই প্রতিফল।" তখনি ঘরে এসে কি কাণ্ডই না আমি করেছি। পশুতে যে কাজ কর্ত্তে লজ্জা বোধ করে আমি তা অনায়াসে সম্পন্ন করেছি। সতী-সাধ্বীর বুকে পিশাচের মত লাথি মেরেছি—নিরু একটী কথা বলে ও প্রতিবাদ কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেনি। বরং যখন বৌদি এসে তা'কে ধল্লেন, তখন সে আমার ব্যবহারে একটু লজ্জিত হয়েছিল। দেবী! আজ তুমি স্বর্গে, কিন্তু তোমায় তো কোনদিন চিন্তে পারি নি—চেনবার চেষ্টাও করি নি। ভাবতুম তুমি কুৎসিতা—তখন কেন বোঝাও নি তুমি সুন্দরী ছিলে—তখন কেন বোঝাওনি তুমি সতী কুলরাণী ছিলে অভিমান ক'রে তুমি চলে গেছ—যখন আর তোমায় দেখবার সম্ভাবনা নেই, ক্ষমা চাইবার অবসর নেই, তখনই বুঝতে পারলুম তুমি কি ছিলে। এটা বুঝি মানুষের সনাতন নিয়মের মধ্যে নইলে বিচ্ছেদেই মানুষকে ভাল করে বোঝা যায় কেন?

সেই দু'ঘা লাথিতেই তা'র ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌তে লাগ্‌লো। হয়তো তোমরা অনেকে আমায় হতভাগ্য বলে মনে কর্ব্বে—কারণ নিজের লজ্জাকর কাহিনী নিজেকেই লিপিবদ্ধ কর্ত্তে হচ্ছে! কিন্তু আমি তা' মনে করিনে, কেন না আমি জানি পাপই হোক, আর পুণ্যই হোক যখন সে কাজটা ক'রে ফেলেছি তখন তা'র ফলাফল সম্বন্ধে জগৎকে জানিয়ে গেলে জগতের অনেক উপকার ত' হবেই তা ছাড়া মানুষের সত্য পরিচয়টাও দেওয়া হ'বে—থা'ক সে কথা।—রক্ত দেখে বৌদি ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকবার কথা বল্লেন। নিরু কিন্তু বাধা দিলে, সে বল্লে "না বাবাকে এখন বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। এখনি একটা মিছিমিছি হৈচৈ বাধাবেন। সে একটু জল চেয়ে নিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলে জোর ক'রে মুখ চেপে রইল। আসন্ন বিপদ কেটে গেল দেখে আমি একটু স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। পাছে আমার অপমান হয়, এইভয়ে নিরু ডাক্তর ডাকৃতে বারণ ক'রে দিলে। এখন সেটা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু তখন পারিনি, একেই বুঝি বলে অদৃষ্ট।

হঠাৎ কাজটা করে আমার বড় লজ্জা হ'ল—তাই একটু লৌকিকতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লুম—"তোমার কি বড় লেগেছে?" একটু হেসে নিরু তা'র বড় বড় চোখ দুটো আমার মুখের উপর রেখে মুখখানাকে সহজ ক'রে জোর করে বল্লে "না"। বল্লে বটে "না" কিন্তু তা'র ওই "না" শব্দটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধলো। আর তার চোখ দুটো বল্লে "এ লাগাটা তত বেশী লাগা নয় যত লেগেছে তোমার নির্ম্মম ব্যবহারে।" হায়, তখন এ কথাটা কেন বুঝিনি? তখন যদি বুঝতুম তা'হ'লে কান্নার পালা আমার অনেকদিন ফুরুতো কিন্তু তাতো হবার নয়। যখন মানুষ নিজেকে ত্যাখে—যখন যৌবনের মদগর্ব্বে স্ফীত হয়—যখন তা'র নিজের মস্তকে বড় কর্ব্বার, পূজনীয় কর্ব্বার চেষ্টা থাকে—তখন কা'রো কথা সে বুঝতে পারে না—চেষ্টাও করে না। আমিও একদিন মদগর্ব্বে উৎফুল্ল হ'য়ে সতীরাণীর সে নীরব চাউনির অর্থ বুঝতে পারিনি—আর আজ সেইজন্যেই না এত অনুশোচনা!!

* * *

নিরুপমার কথা।

সেই সেদিনের পর থেকে আমার রোগ আর সারতে চাইছে না। ডাক্তার নাকি বলেছে আমার "যক্ষ্মা" হ'বার লক্ষণ সব দেখা দিয়েছে। ভাল কথা, অবশ্য বাবা কোনদিন এ সংবাদটা দেন নি, দিয়েছিলেন কষ্ট ক'রে আমার স্নেহময়ী বড়জা! আমিও বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে আমার জীবনী শক্তি কমে আসছে। বড়জার মুখে কথাটা শুনে একটু আহ্লাদ হ'ল আবার একটু দুঃখও হ'ল। আনন্দ হ'ল এইজন্যে যে এতদিনের চাওয়া মরণ এইবার বুঝি সত্যসত্যই পেলুম। সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এইবার বুঝি সত্যই আমায় শান্তি এনে দেবে। আর দুঃখ হ'চ্ছে এইজন্য যে প্রাণভরে বাবার সেবা কর্ত্তে পার্ব্বো না বলে'; কিন্তু এও বলি সারা জীবনটা এমন ক'রে স্বামীর উপেক্ষা সহ্য করে' বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ সহস্র গুণে ভাল। তাই দুঃখের চেয়ে আনন্দ হয়েছিল বেশী। ডাক্তার বাইরে যাওয়ার কথা বল্লে।' 'ডায়মণ্ডহারবারের' গঙ্গার ধার নাকি আজকাল "থায়শিস্" রোগীর পক্ষে ভাল

জায়গা হয়েছে—পুরীর চে'য়ে। বাবা সেইখানে যাওয়ার মত কল্লেন, কারণ সে জায়গাটা নাকি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। আমাদের সঙ্গী হ'ল দুজন দরোয়ান, একজন ঝি, আর একজন বামুনের মেয়ে। এদের নিয়ে আমি আর বাবা হাওয়া খেতে চল্লুম। বড়জা যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাবা জান্‌তেন আমার উপর বড়জা কত সদয়, তাই তিনি আপত্তি কল্লেন—বড়জার যাওয়া হ'ল না।

প্রথম প্রথম ভারি আমোদ হ'তো। দিনে বাবার কাছে বই পড়া গল্প করা আর সকাল সন্ধ্যে গঙ্গার ধারে বেড়ান। একা থাকতে কখন বাবা আমায় দিতেন না। রাত্রে যতক্ষণ না আমার ঘুম আসতো ততক্ষণ আমাদের বামন দিদিটী হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে ব্যাথা ধরিয়ে দিতেন। যত রাজ্যের হাসির গান—কবিতা—গল্পও তাঁর মুখস্থ ছিল।

এমনি ক'রেই আমাদের গোণা সুখের দিন কটা ফুরিয়ে এল। মাসখানেক পরে একদিন রাত্রে জ্বর হ'ল, সেটা না কমে বাড়তেই লাগলো। ভাসুরকে বাবা ডাক্তার নিয়ে আসতে লিখে দিলেন, ডাক্তার এসে কিছু কর্ত্তে পার্‌লে না। বাবা বিরক্ত হ'য়ে অন্য ডাক্তার ডাক্‌তে বল্লেন—ভাসুর এবার কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন।

অরুণের কথা—

ভাদ্রের ভরা গঙ্গার উদ্দাম গতি কেউ রোধ কর্‌তে পারে না; আমিও পারি নি। সে যখন উল্কার মত গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস ক'রে সাগরের বুকে শান্তি পাবার জন্যে ছোটে—তখন কে তার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে? যে অসীম সাহসী পুরুষসিংহ তার সামনে এসে দাঁড়ায় সে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে যায়। যৌবনের উদ্দামগতি—রূপের এ অনন্ত পিপাসা মেটাতে না পেরে—আমার কলঙ্কহীন চরিত্র আমি হারিয়েছিলাম। আর তার ফলে যে আমি কত পাপ করেছি তার সংখ্যা হয় না; কিন্তু তা'র জন্যে আক্ষেপ কর্ব্ব না। বীরের মত তার ফলভোগ কর্ত্তেই আমি চাই। আর এই চাওয়াটাই আমার এখন সব চেয়ে বড় চাওয়া। একদিন আমার সুদিন ছিল—যেদিন আমার আচার ব্যবহার অনুকরণ কর্ব্বার জন্য গ্রাম্য যুবকেরা ব্যাকুল হ'য়ে উঠতো। আমার চরিত্র দেখিয়ে ছেলের মা ছেলেকে উপদেশ দিত। আর আজ আমি তা'দের চোখে চরিত্রহীন—নারীহন্তা পিশাচ মাত্র। কিন্তু আমার এই পতনের মূলে নিরুর সাহায্য কি নেই? সে যদি রূপসী হ'তো, তা' হ'লে ত আজ

আমাকে এমন করে পাপের ফল ভোগ কত্তে হ'তো না। সে যদি ধনীর কন্যা হ'তো তা' হ'লেও হয়তো আজ আমার এত অধঃপতন হ'তো না। ধনীর প্রসাদ ভোজীর কন্যাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা কর্ত্ত। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা হ'ত তার কদাকার চেহারার কথা মনে হ'লে। বাবার চোখে কিন্তু নিরু ছিল দুর্গার মত নিখুঁত। ভাল করে মুখ না দেখলেও যা দেখেছি তাতে মনে হয় কাফ্রি মেয়েদের গায়ের রং এর চেয়ে অনেক ভাল।

তারিখটা ঠিক মনে নেই, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ক্লান্ত মেঘগুলি তখন একটু বিশ্রাম-সুখ অনুভব কচ্ছিল। সহরেও সেদিন অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়েছিল। এমন দিনে ঘরের বার কেউ হয় না—এক কেরাণীজীবী বাঙ্গালী ভিন্ন। বাঙ্গালী হলেও আমি কেরাণী নই। কাজেই জানালার ধারে বসে তখন বর্ষণক্লান্ত মেঘের জলভরা চোখের শোকার্ত্ত চাউনি দেখছি, এমন সময় অলক্ষ্যে বৌদি কখন এসেছেন জানি না। বৌদি বোধ হয় একটু হেসে বল্লেন "কি গো কবি—অমন সাদা মেঘখানার ভেতর কা'কে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।" সুষুপ্তিময় নির্জ্জন কুটীরে হঠাৎ বাজ পড়লে মায়ের বুকে কাপড় ঢাকা শিশু যেমন চম্‌কে উঠে, তেমনি আমিও চম্‌কে উঠে হঠাৎ বলে ফেল্লুম 'আচ্ছা বৌদি, তোমার সে বোনের বিয়ে হয়েছে?" বলেই লজ্জায় মাথা আমার হেঁট হয়ে গেল; এত দিনের পর আজ আবার একি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুল? বৌদি কিন্তু বেশ হেসে বল্লেন "কেন তাকে বিয়ে কর্‌বার সাধ গেল নাকি?" আমি বল্লুম "ছি! বৌদি।" বৌদি বল্লেন, "তাতে হয়েছে কি? ছোট বৌয়ের অসুখ আবার যেমন বাড়াবাড়ী শুন্‌ছি তাতে সে যে বেশীদিন বাঁচবে বলে আমার মনে হয় না। এর পরে—" আমি বাধা দিয়ে বল্লুম "তা' বলে একজনের মরণ কামনা করাটা ভাল নয়" "নয় কেন? যার মরাই উচিত তার মরণ কামনা করায় অনুচিতটা দেখলে কোথায় শুনি?" কথাটা বলে' আমার নীরব দেখে হাসিমুখে বৌদি অর্থপূর্ণ পদধ্বনি করে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা জ্বালাময়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ঘরের এ কোণ থেকে ওকোণে প্রতিধ্বনি ক'রে বেরিয়ে গেল।

তার পরের দিন বেড়িয়ে এসে দেখি বৌদির বোন মলিনা তার কাছে বসে আছে। সদ্য বিবাহিতা-নব-বধূর মত বুকখানা আমার কেঁপে উঠলো। বৌদি বল্লেন "মলিনা, ঠাকুরপোকে নমস্কার কর।" ছবির মত মেয়েটী যখন তা'র ফুলের বোঝার মত হাতটা দিয়ে পায়ের ধুলা নিতে এলো তখন আমার

সমস্ত শরীর বজ্রাহত পথিকের মত আড়ষ্ট হ'য়ে আসছিল। কোন গতিকে উপরে এসে ছোট খাট খানায় শুয়ে পড়লুম। সারা ঘরটা একটা মর্ম্মপীড়িতা বালিকার কথা মনে ক'রে দিলে। কয়লার মত কালো কাকের মত কর্কশ কণ্ঠী একটা বালিকা যেন এসে বল্লে "এই কি শেষ?" আমার বুকখানা কেঁপে উঠলো। শীতের রাতে পথের ধারের নিঃস্ব পথিকের মত নিরু ছিল নারীর ঐশ্বর্য্যে রিক্তা কিন্তু পবিত্রতায় সে ছিল জাহ্নবীর মত নির্ম্মলা। মলিনা রূপসী নারী কিন্তু উভয়ের হৃদয়ে কত প্রভেদ—শেষে বুঝেছিলুম আগে পারি নি। তখন ভেবে দেখিনি যে গিরি পথ নিঃসৃতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে পয়ঃ প্রণালী নির্গত জলধারার তুলনা হয় না। তখন ভেবে দেখিনি পদ্মে ও কিংশুকে, স্বর্গে ও নরকে কত প্রভেদ অবসন্ন চোখ দুটো আমার আস্তে আস্তে বুঁজে এল।

* * * * *

* * * হঠাৎ কাণে গেল "ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্।"

বুঝলুম বৌউদি শিকারের সন্ধানে কা'কে পাঠাচ্ছেন। তখনি উঠে চেয়ারে বসে পড়লুম—তার পর আলমারি থেকে "নৌকাডুবি" খানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ কল্লুম। মলিনা ঘরে এসে খাবারের রেকাবি খানা রেখে বল্লে "দিদি আপনার খাবার পাঠিয়েছেন!" নেহাৎ অভদ্রতা হয় দেখে কোন গতিকে বল্লুম "থাক।" ধীরে, ধীরে মলিনা বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলুম বৌদি বলছেন "কোন বুদ্ধি নেই একেবারে হাবা।" মনে মনে বল্লুম "বুদ্ধি থাকবে কোথা থেকে বৌউদি তোমারই তো বোন?" একটু পরে বৌউদি ঘরে এসে বল্লেন "খাবার পড়ে রহিল যে খেলে না?" মুখভার ক'রে উত্তর দিলুম "ক্ষিধে নেই।" বৌউদি আমায় চিনতেন, দ্বিরুক্তি না ক'রে চলে গেলেন।

সেই থেকে আমায় প্রত্যেক কাজে বৌউদির উপদেশে মলিনা তা'র চাঁপা ফুলের মত দেহখানি নিয়ে চলে বেড়াত। মলিনার সঙ্গ আমার ভাল লাগতো না—আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। এক খাবার সময়, আর মাঝে মাঝে রাত্রে ভিন্ন আমি বাড়ী বড় থাকতুম না। বলবার কেউ নেই দাদা তখন নিরুর বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে ডাক্তার নিয়ে 'ডায়মণ্ডহারবারে' গেছেন। বলবার মধ্যে এক বৌউদি তা কৈ তিনি তো কিছু বলতেন না। মনুষ্যত্বের শেষ সীমানায় আমি যখন নেবে গেছি যখন আমার চরিত্র হীনতায় পূর্ণ অভিনয় হ'চ্ছে তখন হঠাৎ দাদার তার পেলুম "শীঘ্র এস, বৌমার অবস্থা খারাপ।" জানি না হঠাৎ কেন আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস

বুকে ভেঙ্গে বেরবার চেষ্টা কচ্ছে—হঠবৎ বাধাপেয়ে সেটা বুকের ভেতর আঠকে গেল। বৌউদি বল্লেন "কি, খবর?" আমি শুষ্ক মুখে বল্লুম নিরুর অবস্থা খারাপ, আমায় যে'তে দাদা তার করেছেন।

• • • • •

বৌউদির জেদই বাজায় রইল আমায় নিয়ে যে'তে বাধ্য ক'রলেন। গাড়ীতে উঠবার সময় দেখি শুধু বৌউদি নয়—সঙ্গে আবার তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্র মলিনা! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আমার জলে উঠলো, ভাবলুম দুচার কথা শুনিয়ে দেবো —কিন্তু তখন ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছে আমার মত চরিত্র হীনেরও এমন বয়স্থা কুমারীর সঙ্গে ভাল লাগে না, কিন্তু আশ্চর্য্য বৌউদির ধৈর্য্য!

যখন আমরা বাসায় এসে উঠলুম তখন চাঁদের আলোয় আকাশ বাতাস ভ'রে গে'ছে। প্রকৃতির ঘন তরুকুন্তলের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের মধুর হাসি—দূর বনান্তরালে জুঁই ফুলের মত দেখাচ্ছিল। নব বধুর লাজ নত আঁখির মত দু'একটী জোনাকি মাঝে মাঝে দেখাদিচ্ছিল। বাইরের নিস্তব্ধতা ভেতর পর্য্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে—যেন বাড়ীটায় কেউ নেই। কড়ানাড়াতে দরজা খুলে দি'য়ে চাকর আমাদের উপরে নিয়ে গেল। দেখলুম কয়লার মত সেই কালো মেয়েটীর মুখখানি আরো কালো ক'রে মৃত্যুর দুত এসে শিবিরে বসেছে। মরণ পথের যাত্রী এই কিশোরীটী কে দেখে কেন জানি না আমার প্রাণটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশুর মত কেঁদে উঠলো। বিছানার উপর আমি ব'সে পড়লুম। ঘরের সবাই বেরিয়ে গেল; বামুনদি বোধ হয় দরজাটা দিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে তা'র হাত দুখানি কোলের উপর তুলে নিয়ে, ডাকলুম "নিরু।" উষার প্রথম উন্মেষের মত আস্তে আস্তে তা'র চোখের পাতা দু'টো খুলে গেল, একটা অস্বস্তির নিশ্বাস তা'র বুকের ভেতর জমেছিল সেটা যেন বেরিয়ে গেল। আমায় দেখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ঠোট দু'খানা ছাপিয়ে মুখখানিকে তা'র উদ্ভাসিত ক'রে নিমেষের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। এই হাসি আর একদিন, দেখবার সৌভাগ্য হ'য়ে ছিল, যেদিন প্রথম নিরু আমায় আশ্রয় ক'রে সংসারে দাড়ায়—কিন্তু তখন বুঝিনি এ হাসি কত মূল্যবান্।

নিরু তা'র চোখ দু'টো আমার মুখের উপর রেখে কি বলতে গেল—কিন্তু পাল্লে না। কাতরস্বরে আমি বল্লুম "আমায় ক্ষমা ক'র নিরু? তোমায় আমি এতদিনে চিনতে পারি নি" মুখখানি তার একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—জল

ভাবে ছিন্ন মেঘের ফাঁকে তরুণ অরুণ স্বর্ণাভ কিরণের মত। আমার সেই "ঘৃণিতা" মর্ম্ম পীড়িতা, সতীরাণী, নিরু স্বর্গে চলে গেল।

ক্রমশঃ

ইয়ং 'বেঙ্গল'ও বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্য।

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।]

গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিক গতি ও প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার ধারা ইংরাজী ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় ভাবকে লোকে তখন ঘৃণার চক্ষে দেখিত। বিদেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলেই দেশীয় সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বিজেতা রোমান্‌গণ বিজিত গ্রীকদের পুরাণ, সাহিত্য ও দর্শন গ্রহণ করে; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে গ্যালিক বা ফ্রেঞ্চ প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়। ইংরাজী সাহিত্যের বিপুল শক্তি, বিরাট প্রতিভা ও উচ্চ আদর্শ বঙ্গের চিন্তাও ভাবের ধারা এবং আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় চার্লস্‌ রাজা হইবার পর যেমন সমগ্র দেশটা ফরাসী-তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যায়, তেমনি সহজ ভাবে ইংরাজীর ভাগীরথী প্রবাহে বঙ্গের তদানীন্তন অনেক ভাবুক শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ঐরাবতের মতই ভাসিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে নব্য তন্ত্রের যুবকগণকে ব্যাঙ্গচ্ছলে 'নবীন বাঙ্গালী' (young Bengal)—আখ্যা প্রদান করা হইল। ইংরাজীতে অর্দ্ধ শিক্ষিত কলিকাতার বাবু,—গর্ব্বে হিমাচলের মত, ফ্যাশানে কেতাদুরস্ত, খানাপিনায় আহেলে বিলাতী, কথাবার্ত্তায় শেক্‌স্‌পীয়র্‌ মিল্‌টনের রচনা উদ্ধৃতকারী—উভচর জীবটীর নামই 'ইয়ং বেঙ্গল'।*

---

* The Citizen, Tuesday july 8,851) ইংরাজী কবি বায়রনের সময়ে এইরূপ একদল সমাজদ্রোহী যুবক সভ্য ইংরাজ সমাজে বিরোধের জয়ধ্বজা নিখাত করিয়াছিল। "লোকরহস্যে" বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যাত "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত,—তাহাদের আত্মপর ভেদ ছিলনা, পরের জিনিষকে নিজের বলিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতনা, শবমুণ্ডাস্থি-নির্ম্মিত পানপাত্রে তাহারা মদ্যপান করিত, পরের নিকট ধার-করা রুমাল বা জামা আর কখনো তাহারা প্রত্যর্পণ করা উচিত মনে করিত না।

নব্যতন্ত্রের এই যুবকেরা দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও পরোক্ষভাবে বঙ্গীয় সমাজের তাহারা যে উপকার করিয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে। মন্দ জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের উচ্চ আদর্শও বঙ্গীয় সাহিত্যে আসিয়াছে,—আবর্জ্জনাময় বর্ষার নদীধারা অপেয় হইলেও যেমন বিপুল বন্যায় দুই কূল উর্ব্বর করিয়া চলে, তেমনি এই বিদেশী সাহিত্যের প্রবাহ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিকর হইলেও সমষ্টিরূপে জাতির কল্যাণই সাধন করিয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তার প্রণালী ও কর্ম্মজীবনের আদর্শ এইরূপে মিলনের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। সে যুগের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি দুইটী দেশের মধ্যে তন্ত্রধারকের কাজ করিয়াছিলেন। পেয়ারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জজ্ দ্বারকানাথ মিত্র, 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র তেজস্বী সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'রেইস্ এণ্ড্ রায়তের ধীমান্ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাহাদের বলিবার ও লিখিবার ভঙ্গী তদানীন্তন বিখ্যাত বিলাতী বক্তা ও লেখকগণের আদর্শ হইতে কোনো ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। যুগধর্ম্মানুসারে একযুগের আদর্শ পরবর্ত্তী যুগের আদর্শানুযায়ী হইতে পারে না; সেজন্য কোনো যুগের আদর্শই নির্জ্জলা স্তুতি বা নিন্দাপ্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারে না। আলোচ্য যুগের ইংরাজি শিক্ষায় বহু দোষ থাকিলেও ইহার গুণ সমূহ উপেক্ষনীয় নহে। দেশী ও বিদেশী শিক্ষার সংঘাতের ফলে শেক্স্পীয়রের নাটকাবলিও নূতন প্রণালীতে পঠিত হইতে লাগিল। হিন্দুকলেজের অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ ডি'রোজিও এবং কাপ্টেন্ ডি, এল রিচার্ড্সন্ ছাত্রগণের মধ্যে নূতন ভাবের প্রেরণা জাগাইয়া তুলিলেন। বাঙ্গালীজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের হিরণ্যকশিপু লর্ড মেকলেও তাহাদের সেকস্-পীয়র-আবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। নাট্যকলার উৎকর্ষসাধন, সঙ্ঘগঠনের প্রচেষ্টা, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রীতিস্থাপন, নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা, উন্নত রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প, ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে উদারনীতির প্রয়োগ, স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা ও আন্তর্জাতিক সখ্য প্রভৃতি নানা ভাবের উন্মেষ এই 'ইয়ং বেঙ্গলে"র দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদেশীয় নাট্যসাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন সংস্কৃত নাটকসমূহের দিকে লোকের শ্রদ্ধা কম হয় নাই। দেশীয় নাটকের অভাবে এ সময় বহু ব্যয়ে অনেক ধনী সাহিত্যানুরাগীর গৃহে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সকলের পক্ষে বোধগম্য নহে বলিয়া এই অভিনয়

যথাযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্তই অনুবাদগ্রন্থের প্রয়োজন হইল। সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক্ ও জার্ম্মাণ সাহিত্য হইতে বহু শিক্ষিত লোক অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব এ যুগে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। এই অনুবাদ-সাহিত্যের ফলে বাঙ্গলা ভাষা নানা বিষয়ে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনার অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত এখন তাহা বাঙ্গালায় লেখা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই যুগে সেক্স্পীয়ারের কয়েকখানি সর্ব্বোত্তম নাটক বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত হয়। ইহারও বহুপূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহী অনেক ইংরাজ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে যত্নশীল হইয়াছিল। একশত ত্রিশ বছরের পুরাতন একটী বর্ণ ও চিহ্নপ্রকরণবর্জ্জিত বিজ্ঞাপনে আমরা ইহার নিদর্শন পাই :—

"ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারণ এক বহি অতি সিগ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেব লোকে বাঙ্গালা কথা সিখিবেক এবং বাঙ্গালি লোকে ইংরাজি কথা সিখিবেক অতএব সকল লোকের কেফাএত কারণ এই বহি তৈয়ার করা জাইতেছে জে ২ লোকে চাহে তাহারা মেং আবজান [Mr. Upjohn] সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮ বাঙ্গলা তারিখ ৯ চৈত্র।"*

এই দৈনিক সংবাদপত্রখানি মি এ আপজন ৮ নম্বর লালবাজার হইতে প্রকাশিত করিতেন। পুস্তক-বিক্রয়-ব্যবসায়ে তিনি সেকালের 'গুরুদাস চাটুয্যে' ছিলেন। উদ্ধৃতাংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষার নমুনামাত্র নহে, ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষার আদান প্রদান করিবার আন্তরিক চেষ্টা অনুবাদ কার্য্য ভালরূপে চলিবার জন্ম তৎকালে Vernacular Literature Committee-নামক একটী সংসৎ স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ডব্লু সিটন-কার, রেঃ, জে, লঙ প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন এবং সকলেই বাঙ্গালা ভাষার দ্রুত উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। অনুবাদকার্য্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা সাহিত্যিক-গণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত 'কলম্বসের জীবন-চরিত", রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "শিবাজীর জীবনী" লঙ সাহেবের

* Calcutta Chronicle, Tuesday, march 20, 1792.

"Selections from the Native press" এই সভা হইতে প্রকাশিত হয়। Annual Register নামক বাৎসরিক পঞ্জী এই সভার মুখপত্র ছিল।

(Vide The Citizen, Monday, July 12, 1852.)

ইহার ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে "কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী" স্থাপিত হয়। ইহার কাজ ছিল—"The preparation,publication of cheap or gratuitious supply of works (English as well as Asiatic) useful in schools and seminaries of learning." ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন পুস্তক এই পরিষদের দ্বারা প্রকাশিত হইত না। ইহার চতুর্থ বৎসরে (১৮২১ খৃঃ অঃ) গভর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করেন ও এককালীন ৭০০০৲ ও মাসিক ৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। এই পরিষৎ কর্ত্তৃক সর্ব্বসমেত ১০৪,১৮২ সংখ্যক গ্রন্থ নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল—সংস্কৃত ৩৪০, বাঙ্গালা ৬৩,৩৪৭ ও হিন্দুস্থানী ৭৬২২। (The Asiatic Journal, March, 1826, in an article called, Progress of Education in British India, p 325

অন্যান্য অনুবাদগ্রন্থ নিয়ে উল্লিখিত হইল—

১। সোলন্ ও পাবলিকোলার জীবনচরিত (Bioi Parallegoi) সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রীক হইতে অনূদিত।

(Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum, by J. F. Blumhardt, London, 1886, p, 102)

২। টমকাকার কুটীর—তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত, কলিকাতা, ১৮৬৩। *

৩। মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট্, ১৮৬৯, কলিকাতা। †

৪। হান্স্ খ্রীষ্টিয়ান্ আণ্ডারসনের গল্প—মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৫৭ ও ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে অনূদিত – চীনদেশীয় বুলবুল, কুৎসিত হংস-শাবক, মরমেত (Mermaid), পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, বিচার অর্থাৎ বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষপরীক্ষা।

---

* Op. cit., p. 103)

† "The work is described on the title-page as Bose's works, Pt. I. No clue has been found to the full name of the author"—Op. Cit., p. 66.

৫। ব্যনিয়ানের "যাত্রীকের গতি" (Pilgrim's progress) কলিকাতা ১৮৫২। *

৬। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (কৃষ্ণমিশ্র)—কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন,—রামকিঙ্কর শিরোমণি কর্ত্তৃক অনূদিত। ১৮৫৫।

৭। মালতীমাধব—কালিপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ (১৮৫৯)।

৮। উত্তর রামচরিচত নাটক—তারাকুমার কবিরত্ন (১৮৭১)।

৯। মৈথিলীমিলন নাটক (ভবভূতি বিরচিত 'উত্তররামচরিত' হইতে)।

১০। রোমিও ও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান গুরুদাস হাজরার অনুবাদ, ১৮৪৮। †

১১। মহানাটক—(মধুসূদন মিত্রের পাঠ) রামগতি ভট্টাচার্য্য কবিরত্নের অনুবাদ, ১৮৭৮। ‡

১২। চারুমুখচিত্তহরা নাটক—শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষ কৃত (১৮৬৩)

১৩। শকুন্তলার অনুবাদ—

(ক) শকুন্তলা—বিদ্যাসাগর কৃত (১৮৫৪)

---

* Supplementary Catalogue of Bengali Books by Blumhardt, 1910. P. 43.

† ইয়োরোপীয় বিয়োগান্ত নাটকের ইহাই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ। ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও নাটকের বঙ্গানুবাদ আমি দেখি নাই। সেকালে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকের চক্ষে এই কাহিনীটি অপূর্ব্ব ও বিচিত্র বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

‡ ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা কালীকৃষ্ণের অনুবাদ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ-সহ প্রকাশিত হয়। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে এই গ্রন্থ রাজা উৎসর্গ করেন। উপহার পৃষ্ঠা এইরূপ—"শ্রীমন্মহানাটকঃ। অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নৃপতি রামচন্দ্রচরিত। শ্রীমদ্ধনুমতা বিরচিতগ্রন্থঃ। ইদানীন্ত মূলসংস্কৃতাদুদ্ধৃত তদর্থেঙ্গলণ্ডীয়ভাষয়া। শোভাবাজারস্থ শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরেণ। অনুবাদিতঃ নগরঘর কলিকাতান্তর্গত। সারসংগ্রহযন্ত্রে শ্রীনবকৃষ্ণ সরকারেণ মুদ্রাঙ্কিতঃ। শকাব্দ ১৭৬২।

প্রধান [তম ?] ব্রীটন আইরলণ্ডমহারাজাদ্বয়াধিকারিণী কৃপাপ্রকাশিনী। পরমারাধিনী বিবিধযশস্বিনী প্রতাপশালিনী মহারাজ্ঞী। শ্রীমতী বিক্টোরিয়া। সাম্রাজ্যবর্দ্ধিনী বিজয়িনী লোকপ্রতিপালিনী নানানীতিশাস্ত্রবিনোদিনী। গুণিগণগ্রাহিনী সম্মতানুসারতঃ সংস্কৃত প্রচলিত। শ্রীমন্মহানাটকগ্রন্থস্য। ইংলণ্ডীয় ভাষয়ানুবাদঃ। সেনকরাজক শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃকঃ। তন্মহাভিধানোদ্দেশতঃ। কৃতোপায়নঃ।"

(খ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা—নন্দকুমার রায় কৃত সর্ব্ব প্রথম পদ্যানুবাদ (সময় ?)

(গ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ও জগমোহন তর্কালঙ্কার কৃত (১৮৬৯)

১৪। মুদ্রারাক্ষস—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন কৃত (১৮৭১)

১৫। রত্নাবলী নাটক—রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত (১৮৫৭)

১৬। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের অনুবাদ (১৮৫৮)

১৭। (ক) বিক্রমোর্ব্বশী- দ্বারকানাথ গুপ্তের অনুবাদ (১৮৬২)

(খ) বিক্রমোর্ব্বশী—রামসদয় ভট্টাচার্য্যকৃত (১৮৫৯) •

১৮। (ক) মালতীমাধব—ভবভূতির নাটকের গল্পাংশ—কালীপ্রসন্ন ঘোষাল (১৮৫৮)

(খ) মালতীমাধব—লোহারাম শিরোরত্ন (১৮৬০)

১৯। মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্ম্মানুরূপ লেম্বস্ টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা etc. E. Roer কৃত বঙ্গানুবাদ—"Bengali Family Library Series" (১৮৫৩)

২০। টম্ জোন্স্ নামক রহস্য নাটক (Fielding হইতে) মহেশচন্দ্র দাস দে ও গোপালচন্দ্র নাথ কৃত (১৮৬৩)।

২১। বেণীসংহার নাটক। ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ, কেদারনাথ তর্করত্ন কৃত (১৮৭০)।

২২। রত্নাবলী নাটিকা নীলমণি পাল কৃত ও চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত (১৮৪৯)

২৩। সুরলতা নাটক—প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় কৃত শেক্স্পীয়রের Merchant of Venice অবলম্বনে (১৮৭৭)

২৪। অনুতাপিনী নবকামিনী (Nicholas Rowe's Fair Penitent) শ্যামাচরণ দাসদত্ত কর্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত (১৮৫৬)

২৫। বসন্তসেনা। মধুসূদন বাচস্পতি কৃত সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের অনুবাদ (১৮৬৬)

২৬। বাসবদত্তা—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ (১৮৩৬)

• Catalogue of Books in the Library of the Board of Examiners, 1903, Cal.

(হরিমোহন মুখোপধ্যায় কৃত "বঙ্গভাষার লেখক," প্রথম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

২৭। ভানুমতীচিত্তবিলাস—হরচন্দ্র ঘোষ কৃত শেক্স্পীয়রের Merchant of Venice অবলম্বনে। (?)

২৮। চন্দ্রবতী—নিমাইচাঁদশীল কৃত (Reynold's Loves of the Harem)

২৯। টেলিমেকস্—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত দুইখণ্ডে সমাপ্ত (১৮৫৮-৬০)।

নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে এই সমস্ত সুবিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। গল্প, কথাসাহিত্য, নাটক, পৌরাণিক কাহিনী, জীবনচরিত, উপাখ্যান, হাস্য-রসপূর্ণ কথোপকথন, প্রহসন, প্রবন্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার রচনার বাঙ্গালায় আবির্ভাব হইল। খৃঃ পূঃ ১৮০০ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালায় এই সব পুস্তকগুলি অনূদিত হয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী হইতে অনুবাদিত পূর্ব্বোক্ত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকখানিমাত্র এমেচার থিয়েটার দল কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। ভাবাতিশয্যই এই যুগের ভাষার একমাত্র লক্ষণ। কোনও বর্ণনা করিতে হইলে সংস্কৃত সমাসঘটিত যতিবিহীন সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর প্রয়োগ তখন রুচিসঙ্গত ছিল। সাধারণ পাঠকের নাটক সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা ছিল না। তাহারা কবির গানের সহিত হাফ্ আখড়াই, পাঁচালীর সহিত তর্জ্জার গোল করিত। তাহারা মনে করিত একটী গল্পকে কথোপকথনের ভঙ্গীতে বলিতে পারিলেই তাহাকে 'নাটক' বলা যায়। এই অস্পষ্ট ও অদ্ভুত ধারণার নিরসন হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। "ইয়ং বেঙ্গল" যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে এখনো শেষ আহুতি পড়ে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই নানাদিকপ্রসারী প্রতিভা সঞ্চয় করিতে বাঙ্গালা দেশকে অনেক স্বার্থ বলি দিতে হইয়াছিল। মাইকেল দত্ত খৃষ্টান্ হইয়াছিলেন; শম্ভুচন্দ্র, রামগোপাল প্রভৃতি ইংরাজীতত্ত্বে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, অন্যান্য অনেককে ইংরাজীর মায়ায় চিরমুগ্ধ হইতে হইয়াছিল! কিন্তু সর্ব্বত্রই একটী ধারা বহিয়াছে সকলেরই হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশীয় উন্নতির প্রচেষ্টা হবিস্পুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়াছিল।*

---

* লেখক-প্রণীত ইংরাজি-গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের মর্ম্মানুবাদ।

বর্ষা বিভ্রাট।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী]

বলাকা বিজলী বিলাসী জলদ
সাজায়েছে নিজ কান্তি দিয়া,
গিরি শিরশায়ী নীল মণ্ডপে
দ্বিগুণ সুষমা বিস্তারিয়া!
একি মেঘ সখি! এমন নীলিমা,
নয়নে কখনো দেখিনি আর,
দাঁড়া দেখি আজ দেখি ভাল করে'
দেখিবনা বুঝি পুনর্ব্বার!
মেঘ নয় এত! বিজলী নয়রে!
কণ্ঠে দোদুল গুঞ্জা হার,
পরিধানে পীত বসন; একেগো
অচল উজ্জ্বল হাসিতে যা'র!
নয়ন পথের পথিক হ'য়েছে
এ অতুল শোভা অনেক বার,
হেন ভঙ্গিমা, মধুরিমা আমি
দেখিনিত আগে দেখিনি আর!
এক অঙ্গের শোভা নিরখিতে
নিমীলিত হ'য়ে আসে যে আঁখি
এই লাবণ্য সিন্ধু হেরিব,
কোন্ লহরীরে না দেখে রাখি?
এক বিন্দুর শোভা বর্ণিতে
রসনা আমার আবেশে মুক,
শুধু দেখি সখি, দেখার পুলকে,
থর থর করে' কাঁপে যে বুক!

বন্দী-জীবন।

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল)

সেই আসন্ন বিপ্লবের সকল আয়োজনের মধ্যে আমাদের অনেকের মনেই কেমন এক অনির্দ্দেশ্য ভয় ও সন্দেহের ভাব বিদ্যমান ছিল, আমরা যেন নিঃসংশয় রূপে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে সত্যই বিপ্লব আরম্ভ হইবে। শত সহস্র বৎসরের দীনতা ও হীনতায়, পরবশতায় সহস্র গণ্ডীর আবেষ্টনে আমরা এমনি আত্মশক্তিতে আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে স্বাধীনতার পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করিতে পারিলেও এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও আমরা যেন আমাদের শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে বিপ্লব সত্যই আরম্ভ হইবে। জন্মদুঃখী যেমন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে কোনও দিন আবার তাহারও ভাগ্যে সুখোদয় হইবে,—চির উপেক্ষিত, চির বঞ্চিত যেমন আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিলেও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে কোনও দিন আবার সেও কাহারও প্রেমাস্পদ হইতে পারে, আমরাও যেন ঠিক তেমন ভাবেই ভারতের ভাগ্যোদয়ে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এইরূপ মনের ভাব লইয়াই বিপ্লবের আয়োজন চলিতে লাগিল। বাঙ্গলায় বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপ্লবকারিদিগের জন্য হাফপ্যাণ্ট তৈয়ারি হইল। পাঞ্জাবে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈয়ারি হইল। সেই পতাকার বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে শিখেরা নিজেদের বিশিষ্ট চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও ভারতের অন্যান্য জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ ভারতের জাতীয় পতাকা চতুর্ব্বর্ণান্বিত হইল। কোথাও রসদের বন্দোবস্ত হইল, কোথাও কোথাও বা স্থানীয় মোটর, লরি, প্রভৃতি বিভিন্ন যানের তালিকা প্রস্তুত হইল। সারা উত্তর ভারতের বিপ্লবপন্থীরা কত উদ্বেগের সহিতই না পাঞ্জাবের দিকে তাকাইয়া দিন গণিতে লাগিলেন, পাঞ্জাবের সঙ্কেত হেলনেই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাৎ আরম্ভ হইয়া যাইবে। শোনা গিয়াছিল শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু নাকি বলিয়াছিলেন ১২ বৎসরের তপস্যার পর তিনি যেদিন স্বীয় গুহা হইতে বাহির হইবেন সে দিন হইতেই ভারতের স্বাধীনতার যুগ আরম্ভ হইবে। তিনিও এই ১৯১৫ সালের বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বীয় গুহা হইতে বাহির

হন। অবশ্য এই বিপ্লবের আয়োজনের বিষয় তিনি ঘুনাক্ষরেও কিছু জানিতেন না। কিন্তু বাহির হইয়া তিনি ইঙ্গিতে বলেন এখনও কিছু বিলম্ব আছে এবং এই বলিয়া পুনরায় তিনি স্বীয় গুহায় প্রবেশ করেন। ভগবানের অভিপ্রায় সকল সময় ঠিক বোঝা যায় না। সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের সকল পুরুষার্থ যেমন বারে বারে ব্যর্থ হইয়াছে, এবারেও তেমনি সারা উত্তর ভারত জোড়া এত বড় বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইল। কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই যেন তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া দেবতার পূজায় অর্ঘ্য প্রদান করা হইল। কেমন করিয়া এমন হইল তাহাই বলিতেছি।

পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগে একটি মুসলমান ডেপুটি সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট কৃপাল সিং নামে জনৈক শিখকে নিজের চর রূপে এই বিপ্লবদলে ঢুকাইয়া দেন। কৃপাল সিংএর কোনও সম্পর্কের একটি ভাই ইংরাজ সৈনিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন এবং তিনি এই বিপ্লব দলেও যোগ দেন। প্রধানত এই সৈনিকের সাহায্যেই কৃপাল সিং সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে এই দলে প্রবেশ লাভ করেন। ইঁহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু কৃপাল সিংএর গতিবিধির প্রতি অনেকের সন্দেহ আকৃষ্ট হয়। তখন কয়েকটি নেতার পরামর্শে ইঁহাকে সর্ব্বদা চ'খে চ'খে রাখা ঠিক হয় এবং ইহার ফলে দুই চারিদিনের মধ্যেই প্রকাশ পায় যে ইনি পুলিশের কর্ত্তাদের নিকট নিত্য নিয়মিত যাওয়া আসা করেন। এদিকে বিপ্লব আরম্ভ হইবার আর দিন কয়েক মাত্র বিলম্ব আছে। এইরূপ অবস্থায় যদি ইঁহাকে এ দুনিয়া হইতে সরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এমন বিষম একটা গোলযোগ আরম্ভ হইতে পারে যাহাতে আমাদের শেষ মনোরথ সিদ্ধির পথে হয়ত বিষম বাধা উপস্থিত হইবে। এইরূপ আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়াই তখন তাঁহাকে একেবারে সরাইয়া ফেলিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলার লোকেরা তাঁহাকে বাঁচিবার দায় হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি দিতেন। যাহা হউক ক্রমে জানিতে পারা গেল যে বিপ্লবের জন্ত যে দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহাও পুলিশ জানিতে পারিয়াছে, কারণ কৃপাল সিং সে তারিখ জানিত। অগত্যা ঠিক করা হইল যে কৃপাল সিংকে আর বাটির বাহির হইতে দেওয়া হইবে না এবং বিপ্লবের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারি হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারি করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভাগ্য দোষেই হউক অথবা ভাগ্যক্রমেই হউক বিপ্লবের এই নূতন তারিখের সংবাদ সেনানিবাসে দিয়া আসিবার ভার যাহার উপর পড়িয়াছিল তিনি যখন সেনা নিবাসে সেই খবর দিয়া আসিয়া রাস-

বিহারীর নিকট বলিলেন "সেনানিবাসে ১৯শে ফেব্রুয়ারির কথা বলিয়া আসিলাম" ঠিক সেই সময় কৃপাল সিংও সেই খানেই বসিয়া। কৃপাল সিংএর কথা সকলে ত জানিত না। এই ঘটনা বোধ হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইল। সেই দিনই দুপুর বেলায় যখন সকলে আহার করিতে এদিক ওদিক গিয়াছে তখন কৃপাল সিংও বাটির বাহির হইবার উপক্রম করিল। কৃপাল সিংএর নিকট যিনি ছিলেন তিনি তাঁর হাত ধরিয়া আর টানটানি না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকটেই রহিলেন। কৃপাল সিং বাটির বাহির হইতেই দেখিতে পাইল গোয়েন্দা বিভাগের একটি লোক সাইকেল করিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। তাহার সহিত দেখা হইবামাত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের সংবাদ পুলিশে চলিয়া গেল এবং তার অল্প কয়েক ঘণ্টার পরেই ধর পাকড় আরম্ভ হইয়া গেল। কৃপাল সিং যে বাটিতে ছিলেন সেই বাটিতে ৭।৮ জন গ্রেপ্তার হইলেন আর তাঁহাদের মধ্যে নেতৃ স্থানীয় কয়েকজন ছিলেন। রাসবিহারী যে বাটীতে থাকিতেন সেবাটি দুই একজন নেতা ভিন্ন আর কেহ জানিতেন না, কারণ তিনি যাহাদের সহিত দেখা শুনা করিবার প্রয়োজন হইত, সব অন্যান্য বাটিতে করিতেন। ওদিকে সৈনিক-দিগের হস্ত হইতে ম্যাগাজিনের ভার ইংরাজ সৈনিকদিগের হাতে চলিয়া গেল। সহরের সকল ইংরাজ ভলাণ্টিয়ারদিগকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করা হইল। সকলকেই ক্যাম্প করিয়া থাকিতে হইল। যুদ্ধের সময় যেরূপ সতর্ক হইয়া থাকিবার প্রণালীকে পিকেট করা বলে, ইংরাজ সৈনিক ও ভলাণ্টিয়ারেরাও সেইরূপ পিকেট করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্বেত সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। লাহোর, দিল্লী, ফেরোজপুর, সর্ব্বত্রই এইরূপ; সকলে মনে করিল হয়ত বা ইহার সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধেরই কোনও সম্পর্ক আছে। দেশী সিপাহীরা কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণিল (অবশ্য যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল)। এদিকে বিপ্লবের তারিখ আগাইয়া দেওয়াতে গ্রামের সকল লোক সকল দিকে একত্র হইতে পারে নাই। কার্ত্তার সিং মাত্র ৭০।৮০ জন লোক লইয়া ফিরোজপুরের সেনানিবাসে পূর্ব্বেকার কথা মত গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানকার অবস্থাও ঠিক লাহোরের মত,— দেশী সৈন্যের হাত হইতে ম্যাগাজিন ইংরাজ সৈনিকের হাতে চলিয়া গিয়াছে, ইংরাজ সৈনিক অত্যন্ত সতর্কভাবে পিকেট করিতেছে। কার্ত্তার সিং কিন্তু লাহোরের কোন সংবাদই জানেন না।

ব্যারাকে ঐরূপ সতর্কতা থাকা সত্বেও কর্ত্তারসিং দেশী সৈন্যের হাবিলদারদের

সহিত গিয়া দেখা করিলেন। হাবিলদারেরা বলিলেন আরও দিন কয়েক অপেক্ষা না করিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন না কারণ এরূপ অবস্থায় কিছু করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। কার্ত্তার সিং বুঝিলেন এ যাত্রা আর কিছু হইবে না কারণ দু'চারদিন পরের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে তাঁর আর কোনও সংশয় রহিল না। তিনি কতরূপ সৈনিকদিগকে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে আজ তখনই কিছু না করিলে ভবিষ্যতে আর কিছু করা সম্ভব হইবে না। সিপাহিরা প্রত্যুত্তরে ইংরাজ পিকেটদিগের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বুঝাইয়া দিল যে এ সময় কিছু করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে! তাহারা সব জানিয়া শুনিয়া ত আর অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে পা বাড়াইতে পারে না। সেদিন যদি ভারতবাসীর হাতে উপযুক্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকিত তাহা হইলে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও ভারতের বিপ্লব কেহ রোধ করিতে পারিত না। অথবা যদি পূর্ব্বহইতেই শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সৈনিক শ্রেণীতে গিয়া যোগ দিতেন তাহা হইলেও সেদিনের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইত না। সেদিন অগত্যা কার্ত্তার সিংকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। গ্রামের লোকেরা গ্রামে ফিরিয়া গেল। কার্ত্তারসিং লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। পাঞ্জাবময় তখন ধরপাকরের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। যাহারা ধরা পড়িতেছে তাহাদিগের মধ্য হইতে কেহ কেহ আবার স্বীকারোক্তি করিয়া আরও পাঁচজনার নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিতেছে। এইরূপে কখন কখন গ্রামকে গ্রাম ইংসৈনিকদিগের দ্বারা ঘেরাও হওয়ায় বহুলোক একত্র গ্রেপ্তার হইতেছে। দেশীয় সৈনিকদিগের মনে কেমন এক সন্ত্রাসের ভাব দেখা দিয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডির এক দেশীপল্টনকে সৈনিকশ্রেণী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। লাহোরে এখানে সেখানে ক্রমাগত খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তার হইতেছে। শিখ দেখিয়া একটু সন্দেহ হইলেই সোজা থানায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। এইরূপে ধরিতে যাইয়া কখনও কখনও দুইদিকেই গুলি চলিতেছে। এই অল্পকয়েকদিনের মধ্যেই এইরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল দলের পরস্পরকে বিশ্বাস করা ভয়ের কারণ হইয়া পড়িল।— কার্ত্তার সিং বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন। লাহোরে আসিয়া অন্য কোথাও না গিয়া সোজা রাসবিহারীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসবিহারী তখন বিষাদগ্রস্ত মনে একটি খাটের উপর নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিলেন। কার্ত্তারসিংও শান্তভাবে তাঁর পার্শ্বের আর একটি খাটের উপর গিয়া তাঁহার ক্লান্তিভরা অবসন্ন দে-

থানিকে এলাইয়া দিলেন। উভয়ই নীরব। তাঁহাদের সেই ম্লানমৌনতার মধ্য হইতে কতবড় নিদারুণ মর্ম্মপীড়ার কথাই ব্যক্ত হইতে লাগিল। জীবনে এতবড় আঘাত পাওয়া আমাদের কয়জনের ভাগ্যে ঘটে; যাঁর যত বড় কল্পনা ভাবের নিবিড়ত্ব ও গভীরতা যাঁর যত বেশি জীবনে আঘাত পাওয়ার গুরুত্বও তাঁর সেই পরিমাণ অধিক। তাঁহাদের কত বড় আশা শতধা ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের বিরাট আয়োজন যে নিমিষে কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল! এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত মনেই কত ভাব বিপর্য্যয় ঘটে, তাই সৈনিকদের মধ্যেও যে বিষম আতঙ্কের ভাব আসিয়া তাহাদের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! এতবড় যুদ্ধের অবকাশেও বিপ্লবদল এত আয়োজন করিয়াও কিছু করিতে পারিল না! পুনরায় যে কবে আবার এইরূপ সুযোগ আসিবে তা যেন কল্পনার অতীত!—কিন্তু তা সত্বেও এত বড় আঘাতের পরেও আবার তাঁরা কোমর বাঁধিয়া কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। তাঁদের বুকে যেন অফুরন্ত আশা, হৃদয়ের বল যেন নিঃশেষ হইতে চায় না। তাই আবার তারা নবীন উদ্যমে সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভারত-আকাশের নিভৃত এক কোণে তাহাদের চক্ষের দীপ শিখাকেই সম্বল করিয়া সেই হতাশাচ্ছন্ন জীবনপথে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। মানসিক আঘাত তাহারা খুবই পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাহারা অভিভূত হইলেন না। এত বড় মানসিক বলের মর্য্যাদা আমরা কয়জন ভারতবাসি বুঝি! বীরই বীরের মর্য্যাদা বোঝে তাই ভারতীয় বিপ্লবদলকে ইংরাজ যে চক্ষে দেখিতেন বা দেখেন, কয়জন ভারতবাসী তাঁহাদিগকে সে চক্ষে দেখিতে পারেন? ভারতের বিপ্লবদল ভারতবাসীর নিকট চির উপেক্ষিত হইয়াছে। এই উপেক্ষা ভারতীয় বিপ্লবদলের বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথরের মত নিরন্তর নিষ্ঠুর ভাবে নিষ্পেশণ করিত, এত অবজ্ঞা তাঁহারা আর কাহারও নিকট পান নাই। যাঁহাদের নিকট এই বিপ্লবদল সকলের চাইতে বেশী সহানুভূতির আশা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই বিপ্লবদল বেকলমাত্র টিটকারিই শুনিয়াছেন, কিন্তু তাতেও ইঁহারা ভগ্নোদ্দম হন নাই। ইঁহাদের প্রাণ যেন কোন স্বপ্নলোকের কল্পনায় ভরপুর ছিল; নিজেদের প্রাণের সম্বলটুকু ছাড়া যেন ইঁহারা আর কিছুরই ভরসা রাখিতেন না—এই বিপ্লবচেষ্টা পণ্ড হইয়াছিল বটে, কিন্তু সফলতা নিষ্ফলতার দিক হইতে কোনও আন্দোলনকে বিচার করা উচিত নহে। এই আন্দোলনের পশ্চাতে কত বড় আদর্শের কল্পনা ছিল এবং এই আদর্শকে উপলব্ধি করিবার জন্য কয়েকজন কতখানি ত্যাগ

স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন এই সব ধরিয়াই এই আন্দোলনের বিচার হওয়া উচিত। যাহা হউক কোন আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের যুবক বৃন্দেরা জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা করিতে পারিয়াছিলেন সে আলোচনা অন্ত পরিচ্ছেদে করিবার ইচ্ছা আছে। ক্রমশঃ

'অস্পৃশ্য-নারায়ণ।'

[স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ]

জগদ্বরেণ্য কবি যেন দিব্য চক্ষে জন্মভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার গূঢ় কারণ দেখিতে পাইয়া আবেগময় কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"হে মোর দুর্ভাগাদেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

ভগবান কাঙ্গাল সাজিয়া তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মূঢ় তুমি যেদিন অবজ্ঞাভরে তাঁহার পূজা হইতে বিরত হইলে তিনিও সেইদিন সহাস্য বদনে গৃহের সকল শান্তি, সকল কল্যাণ হরণ করিয়া তোমার আঙ্গিনা হইতে বিদায় লইলেন! আজ বহুদিন তাঁহার মন্দিরে আর ধূপ দীপ জ্বলে না, ধূনার গন্ধ মানব মনকে আর তেমন আকুল করিয়া তুলে না, আরতির শঙ্খ ঘণ্টাও বহুদিন হইল থামিয়া গিয়াছে, ভারতবাসি, তুমি এখনও তোমার আতুর নারায়ণকে চিনিতে পারিয়া রুধিরধারে তাহাকে অভিষেক করিতে পার নাই তাই বিধাতার অভিশাপে অপমান ভার এখনও তোমায় দীনহীন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এখনও এক বেলা উদর পুরিয়া আহার পায় না, শিক্ষাহীন হইয়া পশুর মত জীবন যাপন করে হৃদয়ের বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিলেও কেহ শুনিতে পায় না, ভারতের উচ্চবর্ণ নীচ জাতিকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক এখনও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারে না, অন্ন জলের অভাবে সারা ভারতে আজ ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে কিন্তু ভারতের

বিলাস স্রোত তবুও খরতর বেগে প্রবহমান। যে দেশে পতিতের এত অনাদর, বলত, পতিতের ভগবান্ সে দেশের উপর মুখ তুলিয়া চাহিবেন কেন? যে দেশের মানুষ কুকুরকে স্পর্শ করিতে পারে কিন্তু মানুষকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হয়, পতিত ভাইদের ধর্ম্ম দান করা দূরে থাক্, ধর্ম্মের ত্রিসীমানায় যাহারা কখনও আসিতে পায় না, কঠোর পরিশ্রমের ন্যায্য প্রাপ্যের বিনিময়ে যাহারা পায় কেবল ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও কশাঘাত, যাহাদের দেশে মানুষের এত অবমানন', বলত, নর-নারায়ণ সেই দেশের উপর করুণার চক্ষে চাহিবেন কেন? ভারতের মরাগাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে সত্য, যে দেশে মৃত্যু নাই সেই দেশের একজনার অঙ্গুলিস্পর্শে তাহার শব দেহে সত্যই জীবনী সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু কই, সেত ভৈরব হুঙ্কারে জাগিয়া উঠিতেছে না, তাহার চরণের শৃঙ্খল ত আজও খসিয়া পড়িতেছে না? ঐ যে শত সহস্র কুটীরবাসী লক্ষ লক্ষ নরনারী, যাহাদের উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বসন নাই, যাহাদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও বাহুতে শক্তি নাই, যাহারা প্রতিবৎসর পশুর মতই লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষিত সন্তান সন্ততির জনম দান করিয়া তাহাদের জীবন সংগ্রামকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিতেছে,ভারতের প্রাণপক্ষী ঐখানে উহাদেরই ধূলি ধূসরিত দেহপিঞ্জরে লুক্কায়িত আছে, তাহাকে সতেজ করিয়া না তুলিলে ভারত জাগিবে না, বিনাশের হস্ত হইতে তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। অল্প সংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী বা মোটা মাহিনার চাকুরি,করিয়া যাহারা বৈদ্যুতিক পাখার নীচে মহার্ঘ 'সিগার' ফুকিতে ফুকিতে দেশের কল্যাণ চিন্তা করেন, লাট সাহেবের দরবারে ছুটো ছন্দোবদ্ধ কথার ফাঁকা আওয়াজ করিয়া নিজেই নিজকে একজন মং। স্বদেশহিতৈষী বলিয়া ভাবেন, কিন্তু দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার প্রকৃত সময় আসিলে যাঁহারা পুত্র কন্যা পরিবার সহ দেশান্তরিত হন তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদের কি হইবে? যদি ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক, হাড়ি, ডোম, বাউরি, নমঃশূদ্র—যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রমে আমাদের অন্ন ও জীবন ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী নিত্য জোগাইতেছে—রাস্তা ঘাট, পয়ঃ প্রণালী, বাস ভবন, পুষ্করিণী ও বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে, এক কথায় যাহারা আমাদের সমস্ত সুখ, সৌন্দর্য্যের আকর স্বরূপ, তাহারা প্রতি বৎসর শত সহস্র অযত্নে মরিয়া যায়? যাহারা মধুকরের মত দিবা রজনী আমাদের রত্ন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছে, যাহাদের বিপুল উদ্যমে নির্ম্মিত হইতেছে—গগনস্পর্শী শিখরসমন্বিত আমাদের সৌধভবন, বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদ ও যান বাহনাদি, স্বার্থপর আমরা—আবার তাহাদিগকেই অস্পৃশ্য বলিয়া

ঘৃণা করি, সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখি, নির্দ্দোষ তাহাদিগকে পিশাচের মত বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করি। ভারতবাসি, যতদিন না তুমি তোমার দেশের আত্মাকে ভালবাসিতেছ, পূজা করিতেছ, স্বার্থ ত্যাগরূপ তপস্তানুষ্ঠানে সেই নিদ্রিত নারায়ণকে জাগ্রত করিতেছ, ততদিন তোমার সুখ নাই, শান্তি নাই, কল্যাণ নাই, স্বামী বিবেকানন্দের বজ্র নির্ঘোষে তোমার প্রাণে কথঞ্চিৎ সাড়া আসিয়াছে—পতিত ভগবানকে তুমি কতকটা চিনিয়াছ, কিন্তু চিনিবার এখনও অনেক বাকি, পূজোপচারের এখনও অনেক অভাব। সেই চেনাকে বোধ হয় পূর্ণ করিবার জন্ম আসিয়াছেন আর এক মহাত্মা—হৃদয়ে ভালবাসা ও সহানুভূতির হোমানল জ্বালিয়া, :যিনি পূত অঙ্গুলিনির্দ্দেশে স্বদেশের প্রত্যেক কল্যাণকামীর দৃষ্টি আজ সেই পতিত নারায়ণেরদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ব্বে মানব-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"যেদেশে কোটী কোটী মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশলাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ গরীবদের রক্তচুষে খায়, —সে কি দেশ না নরক, সে ধর্ম্ম না পৈশাচিক নৃত্য। • • • ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে, জ্ঞানমার্গ, ভক্তি মার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন করেছেন, এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই এখন ভাতের হাঁড়িতে। • • • • যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য?" উহার পঞ্চবিংশ বর্ষপরে মহাত্মা গান্ধিজী আজ পুনরায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন— "So long as the Hindus wilfully regard untouchability as part of this religion, so long as the maass of Hindus consider it a sin to touch a section of their brethren, Swaraj is impossible of attainment. Yudhisthira expected to obtain swaraj without the untouchables? What crime for which we condemn the government as Satanic, have not we been guilty towards our untouchable brethren?" ইংরাজ রাজপুরুষগণ নিরীহ ভারত বাসীকে বেত্রাঘাত করে, নাকে খত

দেওয়ায়, একাসনে বসিতে দেয় না, তজ্জন্য আমরা আজ কাল তাহাদিগকে 'সয়তান' নামে অভিহিত করি, কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ব্বল অস্পৃশ্য ভাইদের একাসনে বসিতে দিই না, এমন কি তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করি না, ভদ্র পল্লীর মধ্যে তাহারা বাস করিবার অধিকার পায় না, সকল প্রকার সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখি, লঘু পাপে তাহাদের গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করি সুতরাং আমরাও কেন না 'সয়তান' নামে অভিহিত হইব? হয় ত বর্ত্তমান শাসননীতির ভয়ে—আমরা তাহাদের উপর অভীপ্সিত অত্যাচার করিতে পারি না কিন্তু ভবিষ্যতে রাজ্যভার স্বহস্তে আসিলে স্বার্থান্ধ হইয়া আমরা তাহাদের উপর যে অধিকতর অত্যাচার করিব না তাহার নিশ্চয়তা কি? অতএব, স্বরাজকামেচ্ছু ভারতবাসী, আজ তোমাদের কার্য্যে দেখাই বার প্রকৃত সময় আসিয়াছে তোমরা দেশকে কতখানি ভালবাস, জাতিকে কতখানি শ্রদ্ধা কর, স্বদেশের আপামর সাধারণের উপর তোমাদের প্রেম কতখানি গভীর ও বিস্তৃত। অজ্ঞান শিশু, নিজের ভালমন্দ কিছুই বুঝে না—সকল বিষয়ে সে জনক জননীরই মুখাপেক্ষী, জনকজননীই তাহাকে সাধ্যমত ভরণ পোষণ শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা মানুষ করিয়া তুলেন তাহা না করিলে তাঁহাদের পাপগ্রস্ত হইতে হয়। সমাজের শিশুতুল্য নিম্নজাতি সমূহও ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির আশ্রয় ও রক্ষনাবেক্ষণেই জীবন যাপন করে, তাঁহারা উহাদিগকে যেরূপ রাখেন সেই রূপই থাকে, যাহা শিক্ষা দেন তাহাই শিখে, যাহা বলান তাহাই বলে, এক কথায় নিম্নবর্ণ শিশু সন্তানের ন্যায় সকল বিষয়ে উচ্চ বর্ণের উপরই নির্ভর করিয়া তাহাদের সেবাতেই জীবন নিয়মিত করে, উচ্চ বর্ণের কর্ত্তব্য স্বীয় সন্তানসন্ততির ন্যায় তাঁহাদের আশ্রিত জনকে ও সর্ব্বাতোভাবে রক্ষা করা এবং তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলা, তাহা না করিয়া কেবল উহাদের দ্বারা স্বার্থ সাধন করিয়া লইলে ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। আজ এই যুগ সন্ধিক্ষণে স্বদেশ প্রেমিক ভারতবাসীকে জিজ্ঞাসা করি—তাহাদের মধ্যে কয়জন, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধির মত মন মুখ এক করিয়া বলিতে পারেন—"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ এই আমার ধর্ম্ম"—অথবা "I do not want to attain Moksha, I donot want to be re-born. But if I have to be re-born, I should be born an untouchable. So that I may share their sorrows, sufferings and the affronts levelled at them, in order that I

may endeavour to free myself and them from that miserable condition. I therefore pray that if I should be born again, I should do so not as a Bramhin, Kshatriya, Vaisha or Sudra but as an Ati sudra" * যে কোন অধঃপতিত জাতির পক্ষে অল্প কয়েকটী এইরূপ নিঃস্বার্থ হৃদয়ই সেই জাতিকে তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নাই।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

[শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী]

বন্ধু,

আঁধার ঘরে
স্পর্শ দিয়ে
যাহার পরিচয়,
গোপন সে যে
সরম-নত
কোমল অতিশয়।
হিয়ার সাথে
হিয়ার কথা,
কেউ না বুঝে আর,
স্বপ্ন মাঝে
জন্ম লভে
স্বর্গ-দুজনার!
আলোর পথে,
হৈম রথে
বাহির হলে যবে,
ফুলের মালা
তোমার গলে
পরিয়ে দিল সবে।

---

* Young India, may 4th 1921.

সবার সাথে
যোগ দিব যে—
সাধ্য হেন নাই,
বিভল মনে
ঘরের কোণে
রহিনু একলাই !
ফিরলে যবে
দীপ্ত ভালে,
মৌন হাসি-মুখে,
সকল আশা
মিটল মম
নীরব বুকে-বুকে !
সবাই বলে,
আজকে তুমি
চির-আঁধার-ঘরে।
কেউ পাবে না
দেখা তোমার
এক দিনেরো তরে।
বিচ্ছেদেরি
তপ্ত-শেলে
দীর্ণ হিয়া কত
অশ্রুজলে
বিলাপ করি
ফিরছে অবিরত।
মোর কি হল,
বন্ধু, বল,
নাই যে আঁখি-ধার !
মৃত্যু কিগো
বিফল হল
হানতে অসি তার ?

আলোর হাটে
পাইনি দেখা,—
তাই কি বঁধু তাই,
আমা-তোমার
মিলন-মাঝে
ভেদের রেখা নাই !
যেমন ছিল,
তেমনি তর
চলছে আলাপন,
ক্ষণের আয়ু
ফুরায় শুধু
জাগে চিরন্তন !

ডেলি-পেসেঞ্জারের ডাইরী

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ]

আমার পৈতৃক বসবাস বারুইপুর গ্রামে। বেলেঘাটা ষ্টেসন হইতে ট্রেণে প্রায় সোয়া ঘন্টার পথ ২৪ পরগণার মধ্যে উহা একটি গণ্ডগ্রাম। এক সময় ইহার বিস্তৃত ধানের ক্ষেত ও ফলফলারির বাগিচা শুধু যে পেটের ক্ষুধা দূর করিত এমন নয়, নয়নের ও তৃপ্তি সাধন করিত। এখন কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রতাপে উহার লক্ষ্মী-শ্রী অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। সবুজ ধানের উপর ঢেউ খেলে যাওয়া স্নিগ্ধ বাতাস এখন পথিকের ক্লান্তি দূর করিবার সময় একটা আতঙ্ক জাগাইয়া দেয়, পাছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এ রকমে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পল্লীই আজ জনশূন্য, শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইয়া আসিতেছে। তাই আজ সারা বাঙ্গলাময় হাহাকার স্বাস্থ্যহীন নিরন্ন দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। আমাদের যে পল্লীসমাজ সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র ছিল, সেই কেন্দ্র যখন এমনিভাবে ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে তখন সমস্ত জাতিটা যে নিস্তেজ ও অক্ষম হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। এ শ্মশান কবে আবার মনুষ্যের বাসভূমি

হইবে কে জানে! যাক্‌ সে কথা, আমাদের গ্রামখানি ম্যালেরিয়ায় এমনি ভাবে নষ্ট হইলেও কতকটা বাঁচিয়া আছে। আমার পিতৃপুরুষরা ক পুরুষ ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন, তা আমি ঠিক জানি না, তবে পাড়ার বৃদ্ধদের কাছে শুনিতে পাই আমারা-ই নাকি এখানকার আদিম অধিবাসী। আমাদের যে এক সময় বিশেষ বনিয়াদী ঘর ছিল, তার প্রমাণ অনেক আছে। প্রথম ত এখানকার মধ্যে আমাদের বাড়ীটিই সব চেয়ে বড় পাকা দালান, কিন্তু সে দালান এখন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইতে বসিয়াছে। জমিজমার এখন বড় কিছুই নাই। তবে পাড়ার ঠানদিদির কাছে শুনি আমার প্রপিতামহের আমলে আমাদের জোতজমা ক্ষেত খামার খুব বেশীই ছিল, তার আয় থেকে দোল পার্ব্বণ দুর্গোৎসব সবই হইত। আমার ঠাকুরদাদা ও চাষবাস দেখিয়া শুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী ছিল। আয় যে তাঁহার কম ছিল তা নয়, তবে তাঁহার হৃদয়টা ছিল বড় মহৎ, কাহারও অর্থকষ্ট দেখিলে তিনি দুহাতে দান করিয়া ফেলিতেন, ফিরিয়া আর তাহা চাহিতেন না। তা ছাড়া তাঁহার অতিথিসেবা ও খুব বেশী ছিল, বারুইপুর গ্রামে গোলকচন্দ্রের অতিথিসেবা এখন কিংবদন্তীর মধ্যে পরিণত হইয়াছে। মোট কথা ঠাকুরদা গোলকচন্দ্রের আমলে বংশের জমিজমার কতকটা বিক্রী হইয়া যায়। তার উপর তিনি আমার পিতাঠাকুরকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্ত অনেক খরচ করিয়াছিলেন, তবে আমার পিতাঠাকুর চিররুগ্ন থাকায় খুব বেশী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনিও চাষ বাস দেখিয়াই জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার যে এটা আদৌ ভাল লাগিত না তা তাঁহার কাজ কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় বোঝা যাইত। তিনি বাড়ীতে মৃত্যু পর্য্যন্ত লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন এবং আমার শিক্ষার জন্ত সর্ব্বস্ব ব্যয় ও করিয়াছিলেন। ফলে যখন আমি ইউনিভার্সিটির বি এ উপাধির ছাপ লইয়া বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম এই শিক্ষাটা ছাড়া আমার মূলধনের মধ্যে আছে একখানি জীর্ণ দালান এবং এক টুকুরা ধেনো জমি। আমার পাশের সঙ্গে সঙ্গে মা আমার জেদাজেদি করিয়া একটি আধুনিক শিক্ষিতা পুত্রবধূ ঘরে লইয়া আসিলেন। লেখাপড়াটা মাকে ও এত পাইয়া বসিয়াছিল যে তিনি অনেক সুন্দরী কন্তাকে তুচ্ছ করিয়াও একটি মাঝারি রকমের দেখিতে শিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসিলেন। আমার যিনি গৃহিণী হইয়া আসিলেন, তাঁর বর্ণটি উত্তম শ্যামের কিছু উপর, গড়ন মন্দ নয় এবং লেখাপড়ায় তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত

পড়িয়াছেন। যাক্, বিয়ের মাস পাঁচ ছয় পর আমার পিতৃদেব আমাদের মায়া কাটাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সুতরাং আমি তাঁর একমাত্র পুত্র আমার উপরই সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। অনেক চেষ্টাচরিত্র উমেদারির পর এক সাহেবের পাটের আফিসে একটি মাঝারি রকমের চাকরি জোগাড় করিয়া লইলাম। এই চাকরির ব্যাপারে হাঁটাহাটি করিতে করিতে অনেক সময়ে লেখাপড়ার উপর ধিক্কার জন্মিত, কিন্তু পরক্ষণই ভাবিতাম লেখাপড়ার ত দোষ নাই, লেখা পড়ায় যে চাকরীর সন্ধান করিয়া দিবে এমন ত কথা নাই, ইহাতে যে আমার মনের প্রসার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। পেটের ক্ষুধা ভাল করিয়া দূর করিতে পারুক আর নাই পারুক, মনের ক্ষুধা যে অনেকটা মিটাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং এটাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সব চেয়ে বেশী লাভ। যাক্, আফিসে আমার হাজির দিতে হইত দশটার সময় এবং আমি ছিলাম বারুইপুর থেকে কলিকাতার ডেলিপেসেঞ্জার। সুতরাং রোজ সাড়ে আটটার ট্রেণে নাকে মুখে কিছু গুজিয়া রওনা হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আফিসের বড় সাহেব বেশ লোক ভাল ছিলেন, তবে আমার কাজের হিসাব রাখিতেন যে সাহেবটি তাঁর বিদ্যাটা যেমন অল্প ছিল, তাঁর মেজাজটাও ঠিক তেমনি চড়া ছিল, সেটি এমনি উচু পর্দ্দায় বাঁধা থাকিত যে কখন উহাতে গম্ভীর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারিত না। মাঝে মাঝে ট্রেণের বিলম্বের দরুণ আফিসে যাইতে দেরী হইয়া গেলে তিনি আমার উপর তার ভৈরবীর সুরটি ভাজিয়া লইতেন। তখন বড় দুঃখ হইত, মনে হইত এত লেখা পড়া শিখিয়াও গোলামী ছাড়া যখন আমাদের উপায় নাই, তখন আমাদে মূর্খ থাকিয়া আত্মসম্মান জাগিবার পূর্ব্বে সাহেবদের উপাসক হইয়া পড়াই ভাল। হায়রে পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী, গোলামের আবার বিদ্যা!

* * * *

রোজ আটটার মধ্যে স্নান টান সারিয়া লইয়া আহারাদি করিয়া ট্রেণের সন্ধানে বাহির হই। আমার গৃহিণী প্রতিদিন ভোর না হইতে পাখীর গানে জাগিয়া উঠিয়া স্নান সারিয়া রান্নার জোগার করিতে থাকেন। মুখে শব্দ নাই, হাসি মুখে আটটার মধ্যে আমার রান্না করা, দুপুরে খাবার জন্য আমার টিফিন তৈয়ারী করা, পান সাজা, জামা কাপড় ঠিক করা প্রভৃতি সব কাজই এমনি গুছাইয়া করেন যে তাতে বড় ভুলচুক হয় না। কিন্তু রোজ ডেলি পেসেঞ্জারি

করিয়া আর শ্বেতচরণের উপাসনা করিয়া গোলামী মগজে এতটা উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, যে মাঝে মাঝে তাহা ছোটখাট আগ্নেয়গিরির মত ধূম উদ্গীরণ করিতে ছাড়িত না, অবশ্য সেটা বেচারা স্ত্রীর উপরই উদ্গীর্ণ হইত। কারণ আমাদের পুরুষ জাতটার প্রতাপ ত সব কিছু ঐ খানে! বাহিরে যে অপমান লাঞ্ছনা আফিসের সাহেব কিংবা বড়বাবুর নিকট আমাদের সহিতে হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া হয় গৃহে গৃহিণীর উপর। আশ্চর্য্যের বিষয় গোলামী করিয়া করিয়া মনটা এতটাই বিকৃত হইয়া যায় যে ইহাতে কাহারও মনে অনুশোচনাও আসে না। আমারও মাঝে মাঝে স্ত্রীর উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াও পরে কোনও রূপ অনুতাপ আসিত না। কিন্তু স্ত্রী-বেচারী তাহাতে কোন ও রূপ সাড়া শব্দ না দিয়া অধোবদনে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। অথচ বাস্তবিক আমি স্ত্রীকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম, তবে যে মাঝে মাঝে পান হইতে চুন খসিলে মেজাজ সপ্তমে চড়িত তাহার কারণ স্ত্রীর প্রতি বিরাগ নহে, তাহা দাসত্ব কলঙ্কিত মনের বিকার। ইহা ত আদৌ অদ্ভুত নহে কারণ গোলামের জাত পুরুষ আমরা স্ত্রীকে ত আর সহধর্ম্মিণী বা সহকর্ম্মিণী ভাবিতে পারি না, তাকে শুধু ভাবি গৃহকর্ম্মের দাসী আর বিলাসের শয্যাসঙ্গিনী।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার পথে চারিদিকের শ্যামল শোভা দেখিয়া মনটা অল্পক্ষণের জন্ত বেশ প্রফুল্ল হইত। পল্লীর মধ্য দিয়া যখন রেলগাড়ীট নাতিদ্রুতগতিতে পথ বাহিয়া যাইত, তখন তাহার জ্যোৎস্না ধৌত শ্যামলশ্রী বাস্তবিকই নয়ন ও মনকে তৃপ্তি দান করিত। কোথায় ও দেখিতাম গ্রাম্য পুষ্করিণী হইতে কোনও পল্লীবধূ কলসী করিয়া জল তুলিয়া লইতেছে, পুষ্করিণীর একপার্শ্বে একটি মাছরাঙ্গা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। ক্রমে ক্রমে পল্লীগৃহের আঙ্গিনায় প্রদীপ জলিয়া উঠিল, তুলসী তলায় পল্লী-বধূ আসিয়া প্রণাম করিল। কোথাও দাওয়ায় বসিয়া পল্লীশিশুরা কোনও পল্লী বৃদ্ধার নিকট গল্প শুনিতে বসিয়াছে। তার পর যখন উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়া রেলগাড়ীটি ছুটিয়া চলিত, তখন জ্যোৎস্নাপক্ষের চাঁদ উঠিলে মনটা কেন যে থামকা নৃত্য করিতে থাকিত, ঐ শ্বেত কিরণের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া কোন্ অজানা লোকে ছুটিয়া যাইতে চাহিত। বাস্তবিক তখন এই গোলামী মগজে কবিত্বের উদয় হইত। ক্রমে চোখ যখন ক্লান্ত হইয়া আসিত, তখন বাহির হইতে ভিতরে মনটাকে লইয়া আসিতাম, সেখানে তখন নানা রকমের গল্প গুজব গান টপ্পা চলিত। হয়ত আমার পাশ হইতে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—

"হেসে নাও দুদিন বৈত নয়।" বাস্তবিক তার অঙ্গভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিত। হয়ত বা কোনও হতাশ প্রেমিক এক পাশ হইতে বলিয়া ফেলিলেন —"না জীবনটা কিছু না, একটা ইঃ, একটা উঃ, একটা আঃ।" আবার কোনও স্থানে একদল ছোকরা বসিয়া গল্প করিতেছে। দুই একদিন আগে তাহাদের মধ্যে একজন থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কাল মনোমোহনে যে সাজাহান প্লে দেখলাম, একবারে চমৎকার, দানীবাবুর আরঙজেব পার্টটা একটা তাজ্জব ব্যাপার।" কোনওখানে বা আমার মত কোন কেরাণী নিজের জীবনে বিরক্ত হইয়া হয়ত গাহিয়া উঠিলেন—

"সারাদিন খেটে খেটে প্রাণপাখী যায় খাঁচা ছেড়ে
কেরাণী জীবন ফেলে লোটা আর কম্বল নেরে।"

এমনিধারা কত লোকের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে, কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া কখনও বা তাদের সহানুভূতি করিয়া আফিস হইতে গৃহে ফিরিতাম।

* * * *

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে যেমন চারিদিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে আকাশের গায়ের ধ্রুবতারাটি মাঝি মোল্লাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তেমনি আমার এই অবসাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়কে সংসার পথে চালাইয়া লইয়া যাইত আমার জীবনের ধ্রুবতারা আমার জীবনসঙ্গিনী। কেরাণী জীবনে তাপ দগ্ধ মনের উপর যদি এই কোমল প্রলেপ না থাকিত, তবে সেই পোড়া মন কবে যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত কে জানে। অফিস হইতে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতেই মধুর হাসিটি হাসিয়া প্রত্যহ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানই তাহার নিয়ম ছিল। তারপর বস্ত্রপরিবর্ত্তন করা হইলে কিছু জলযোগ দিয়া পাখা খানি লইয়া সে যখন আমায় ব্যজন করিতে থাকিত, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না তাহার হাতের পাখার হাওয়াটা অধিক স্নিগ্ধ না তাহার হাস্য বিকশিত পুষ্পিত দেহ লতাখানি অধিক মনোজ্ঞ। জীবনের গুরুভার লঘু করিবার এই যে একটা অবকাশ, ইহাই যে জীর্ণ মনের সঞ্জীবনী এ কথা শুধু তখনই বোধ হইত যখন অল্পক্ষণ মাত্রের আলাপে সারাদিনের অবসাদ কোথায় পলাইত কে জানে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, মাতার সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া শেষ হইয়া আসিলে আমরা দুইজনে মায়ের কাছে বসিয়া গল্প করিতাম, ইহাতে মায়ের অনুমতি শুধু নয়, আগ্রহ ও ছিল। কোনও কোনও দিন মায়ের অনুরোধে আমার স্ত্রী দুই একটি কীর্ত্তন গান গাহিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। বলিতে ভুলিয়াছিলাম আমার স্ত্রী

গীতবাদ্যেও বিশেষ দক্ষা ছিলেন। তারপর আহারাদি করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিতাম, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও আসিত; কিন্তু তখন অধিক্ষণ বসিত না। বরাবরই স্ত্রীলোকের লেখাপড়ায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং আমার স্ত্রী যদিও কিছুদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে আরও উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সকল বিষয়ে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইলেও লেখা পড়া শেখা বিষয়ে সে আমার কথা কাণে তুলিত না। বোধ হয় এ শিক্ষার উপর তাহার আদৌ আসক্তি ছিল না। এক একদিন আমি জেদ করিয়া বসিতাম, আজ তাহাকে পড়িতেই হইবে। অমনি সে আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত। আমি অভিমান করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিতাম, অল্পদূর গিয়া সে আমার গম্ভীর মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত, হাসিয়াই বলিত—"দেখ, মা ডেকেছেন মার কাছে যাই, রাগ করো না, কাল পড়বো, বুঝলে।" ঐ শেষের "বুঝলে" শব্দটি এমন প্রেম মিশ্রিত সুরে বলিত যে আমার সকল অভিমান দূর হইয়া যাইত, আমি তখনি যাইতে অনুমতি দিয়া বলিতাম—"আচ্ছা যাও, কাল পড়ো।" তারপর শয্যায় শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ না নিদ্রা আসিত তাহার ঐ "বুঝলে" কথাটি প্রাণে যে কি সুধারস ঢালিতে থাকিত,তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। কোনও কোনও দিন যখন অধিক রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, দেখিতাম আমার পায়ের উপর একরাশ চুল সমেত মাথাটা রাখিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ মনে সে নিদ্রা যাইতেছে। তখন ভাবিতাম রাজারাও কি আমার চেয়ে সুখী। সুখ ঐশ্বর্য্যে আছে কি না জানি না, ক্ষমতায় আছে কি না জানি না, পদ মর্য্যাদায় আছে কি না জানি না, তবে সুখ যদি মনের বিমল আনন্দ হয় তবে বলিব তাহা বিশ্বের এই প্রেমরাজ্যে, তাহা নিশ্চয়ই এইখানে।

* * * *

হঠাৎ একদিন অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতময় জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন,"দাসত্ব করিয়া করিয়া বিলাস স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাও, ফিরিয়া চাও।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতবাসী দৈববাণী শোনার মত থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মানুষ হইবার জন্য একটা উদ্দাম ব্যাকুলতা সকলের মনে জাগিল। আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে রেলগাড়ীতে প্রায়ই যুবকদের মুখে এই গানটি শুনিতাম—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তু'লে নে রে ভাই,

দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।"

এই গানটি শুনিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিত, মনে হইত সত্যই আমরা কোন্‌ অপথে বিপথে চলিয়াছি, ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই। মনের মধ্যেই আবার তখন কে বলিত, আছেই ত, "আবার তোরা মানুষ হ'।" ভারাক্রান্ত মনে বাটীতে ফিরিয়া আসিতাম, আসিয়া দেখিতাম আমার মা ও আমার স্ত্রী দুজনেই এ বিষয় আলোচনা করিতেছেন। দেখিয়া বাস্তবিকই আমার আনন্দ হইত; যাহাদের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যায় তারা ও যদি আমার চিন্তার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেটাকি অল্প আনন্দের কথা। তারপর আহারাদি শেষ হইলে আমরা তিনজনে দেশের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতাম, কি করিব তখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে গোলামী যে ভাল নয়, তাহাতে যে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ইহা আমরা তিনজনেই ঠিক করিলাম এবং উহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাও স্থির করিলাম।

একদিন আফিস হইতে বাটী আসিয়া দেখি আমার মাতা ও আমার গৃহিণী দুই জনে দুইটি ঘরে দুইটি চরকা লইয়া সুতা কাটিতে বসিয়াছেন। মায়ের ঘর হইতে স্ত্রীর ঘরে আসিতেই সে আমার দিকে তাকাইয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর সুতা কাটিতে কাটিতে হাসিয়া গান ধরিল—

"চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "বেশ ত, বেশ কাজ পেয়েছ, বুঝলাম দেশের কাজ কচ্ছি, কিন্তু আমার স্থান যে ও অধিকার করবে, ইহাই আমার অসহ্য।" আমার কথা শুনিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে আবার ঐ গান ধরিল, তারপর অনেকক্ষণ তাহারা কেমন করিয়া চরকায় সুতা কাটিতে শিখিয়াছে, কেমন করিয়া পাড়ার ছুতার মিস্ত্রীকে দিয়া পুরাণ ধরণের দুইটা চরকা তৈয়ারী করাইয়াছে, তাহার ইতিহাস আমার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। আমিও বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

• • •

ইতিমধ্যে আমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, মা তাহাকে কোলে লইয়া সারাদিন চরকায় সূতা কাটিতেন। একদিন সূতা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। আমি তখন আফিসে, আমার স্ত্রী জল দিয়া বাতাস করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, আর কিছু ঔষধপত্র দিতে পারে নাই। আমি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মায়ের ধুম জ্বর, বিকারের লক্ষণ, ডাক্তার ডাকিলাম, তিনিও ভরসা দিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন খারাপ রকমের জ্বর, কি হয় বলা যায় না। তারপর দিন আফিস গিয়া এক সপ্তাহের ছুটি চাহিলাম, বড় সাহেব রাজী থাকিলেও ছোট সাহেবের প্ররোচনায় আমার ছুটি মঞ্জুর হইল না। ছোট সাহেব বলিলেন বুড়া মায়ের অসুখ তাহাতে আবার ছুটি কেন, হাসপাতালে দাও। হায় রে, এই ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইহার জন্ত আমরাও লালায়িত। যে শিক্ষায় পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ঈশ্বর ভক্তি শিখায় না, তাহা নিশ্চয়ই শিক্ষা নয় শিক্ষার প্রেত মাত্র। ব্যথিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম মায়ের বিকারের ঘোর সম্পূর্ণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তার ডাকিলাম, ডাক্তার ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি! যাক্, পরের দিনও আফিস গেলাম, মনটা খুবই খারাপ লাগিতে লাগিল, বাম চক্ষু বারে বারে নাচিতে লাগিল, মনে হইতে ছিল কি যেন অশুভ আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিতেই স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এতদিনে মাতৃহারা হইলাম। যাহা হউক মায়ের সৎকারাদি করিয়া বাটী ফিরিলাম। এ চাকরী আর করিব না স্থির করিলাম, যাহাতে শেষ মুহূর্ত্তে মাতাকে সেবা করিবার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিল, সে গোলামী ত্যাগ করিবই। পরে কি করিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মাতার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খোকার অসুখ করিল, তাহার লক্ষণ ও ভাল বোধ হইল না। ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দিয়া খোকার শিয়রে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম "ভগবান্, এ আবার কি পরীক্ষা, এমন কি পাপ করিয়াছি যাহার জন্ত এত আঘাত।" ভাবিতে ভাবিতে বেলা হইয়া গেল, কখন আটটা বাজিয়া গেল লক্ষ্য করি নাই, স্ত্রী আসিয়া তাড়া দিয়া বলিল, "আফিস যাবে না শীঘ্র খেতে এস"। উঠিয়া আহার করিতে গেলাম,

গোলামের যে পুত্রের অসুখেও ভাবিবার সময় নাই একথাটা ভুলিয়া যাওয়াই যে মস্ত অপরাধ। মনের দিকে তাকাইয়া একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিলাম। পোষাক পরিয়া আফিস যাইবার পূর্ব্বে আবার খোকাকে দেখিতে আসিলাম, আমাকে দেখিয়া খোকা ভাঙা ভাঙা কথায় বেদানা চাহিল। আমি বলিলাম আসিবার সময় লইয়া আসিব। ট্রেণ ধরিতে রওয়ানা দিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ ঠিক সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, ঠিক তখনই যেন আমাকে উপহাস করিয়া খলখল পৈশাচিক হাসি হাসিয়া ট্রেণটা চলিয়া গেল। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে আর ট্রেণ নাই, আজ না জানি ছোট সাহেবের কাছে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইবে। বেলায় আফিসে আসিলাম, আসিবামাত্রই ছোট সাহেব অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গালি দিতে লাগিল। আমার মনটাও সেদিন বিরূপ ছিল, আমি ও দুটা কড়া কথা শুনাইয়া বলিলাম, "আমি তোমার চাকরী ছাড়িয়া দিলাম।" সাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"ও, তুমি non-co-operator হবে, বেশ, শুনে সুখী হলাম, তবে একমাস থাক, আমরা লোক দেখে নি।" আফিসে বসিয়া বসিয়া গুমরাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। গভীর ঘনঘটা করিয়া ভীষণ বর্ষণ আরম্ভ হইল, মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতে লাগিল, মনে হইল সৃষ্টি বুঝি এইবার ধ্বংসের পথে চলিল। জানালার ধারে বসিয়া সেই মেঘ ও বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ ছোট সাহেবের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, সংবাদ লইয়া জানিলাম এক দরিদ্র ভিখারী ঝড় বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাকেই বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিতে গিয়া ছোট সাহেব গর্জ্জন করিতেছিলেন। ভাবিতে লাগিলাম, এরা মানুষ না পশু ; অথবা এই গোলামের জাতিটাকেই উহারা পশুর মত মনে করেন। এখন বুঝিলাম কেন মহাত্মা ইহাদের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ হইয়া না বাঁচিতে পারিলে এ রকম গোলামী করিয়া যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ বাচাকে ধিক্কার দেওয়া এ বোধটা আমার চক্ষে সে দিন স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভারাক্রান্ত মনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই মনে পড়িয়া গেল, খোকার জন্য ত বেদানা লওয়া হইল না। পোড়া মন স্নেহের দাবিটা ও

যে ভুলিয়া গেল ইহাই ত বারে বারে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। গাড়ীতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। জানিনা এখনও কত দুঃখ আমার জন্ম সঞ্চিত আছে। চাকরী ত ছাড়িয়া দিলাম, এখন কি করিয়া আহারের সংস্থান হইবে ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ ট্রেণের এক কোণে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—

"তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরে ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষায় চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।"

মনের মাঝখান হইতে কে বলিয়া উঠিল, এই ত পথ, এই ত আমাদের অধিকার, তবে কেন ভাবনা। ভাবিয়া ত আর কুলকিনারা পাওয়া যায় না, যিনি সব ভাবনার মালিক, তিনিই আমাদের জন্য ভাবিতেছেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে সব কথা বলিয়া ভবিষ্যতে চাষবাস করিয়া খাইব এই কথাও তাহাকে জানাইলাম। আমার ভয় ছিল পাছে সে স্বীকৃতা না হয়, কিন্তু তখন আমার বড়ই অহ্লাদ হইল এবং আপনাকে এত দুঃখের মধ্যে ও ভাগ্যবান বলিয়া মনে হইল যখন অতিশয় উৎসাহের সহিত গৃহিণী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

খোকার জ্বর কিন্তু ছাড়িতে চাহিল না। ভুগিয়া ভুগিয়া দশদিনের দিন সে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। উপরি উপরি দুইটা শোকে একেবারে মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কান্নাকে শেষ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার গৃহিণী আমার অবস্থা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য রকমের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি অত কষ্ট করছ কেন ? ঈশ্বরের ইচ্ছায় খোকা তার ঠাকুমার কাছে চলে গেছে, এস আমরা এখন বন্ধন হীন হয়ে দেশের কাজ করি।" স্ত্রীর কথায় কতটা শান্তি লাভ করিয়া আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্যের পন্থা আলোচনা করিতে লাগিলাম দুই একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে বুঝিতে পারিতেছিলাম কত বড় ব্যথা সে বুকে চাপিয়া রাখিয়া সহজ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিতে ছিল। এই ত ত্যাগ! এই ত নিষ্ঠা!

আফিসে আজ শেষ দিন গিয়া কাজ বুঝাইয়া চলিয়া আসিবার কথা। সমস্ত দিন পরিচিত সহকর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা

বলিয়া, দেশের সেবা করিবার ইচ্ছা জানাইয়া সকলের উপদেশ, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। ফিরিয়াই দেখি বিনা মেঘে বজ্রপাত। আমার নয়নের মণি, আমার ভবার্ণবের কর্ণধার আমার স্নেহময়ী গৃহিণী গ্রাম্য কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। তখনি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমার গৃহ অন্ধকার করিয়া আমার আনন্দের দীপটী নির্ব্বাপিত হইল। এত নিদারুণ ব্যথায় কান্না পর্য্যন্ত বাহির হইল না, প্রচণ্ড ব্যথার জ্বালায় চোখের জলের উৎস ও যেন শুকাইয়া গিয়াছে। যেমন ভীষণ আঘাত লাগিলে একটা কাল শিরা দাগ পড়িয়া সে স্থানটাকে অবশ করিয়া দেয়, রক্ত ও পড়ে না, বেদনার অনুভূতিও থাকে না; সেইরূপ এই বিরাট বেদনা আমার হৃদয়কে যেন অসাড় করিয়া দিয়া গেল। দূরে দুই একটি তারা উঠিয়া বলিয়া দিয়া গেল—আমরা শুধু শাশ্বত, আর সবই ভঙ্গুর, আমরা শুধু হাসিয়া ভাসিয়া যাই, তোমাদের শুধু কর্ত্তব্য, তোমাদের হাসিবার, গর্ব্ব করিবার, আনন্দ করিবার কিছুই নাই। অনতিদূরে একটি শিবমন্দিরের ভাঙ্গা অঙ্গনে একটু সাধু তখন গাহিতেছিল—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর।"

হঠাৎ আমি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলাম, প্রভু তাই হ'ক, আজ সংসারের সঙ্গে ও আমার non-co-operation। এখন শুধু দেশ আর আমি।

ডালি

একখানি খোলা চিঠি।

[এই পত্রখানি আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত টেরেন্স ম্যাকস্থইনির ভগ্নী মিস্ ম্যাক্‌স্থইনি কর্ত্তৃক লিখিত। গত ১৫ই জুলাই তারিখের 'নেশন্' ও 'এথেনিয়ম্' পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়।]

গ্রেটব্রিটেনবাসী নরনারী বৃন্দ,

অধিক দিনের কথা নহে তোমরা একটি মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ। গণতন্ত্র সমূহকে নিরাপদ করিবার জন্ম, ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জের অধিকার সংরক্ষণের জন্ম এবং ন্যায় ও সভ্যতার মূল নীতিগুলির রক্ষাকল্পে ঐ যুদ্ধের আয়োজন করা

হইয়াছিল, তোমাদিগকে এইরূপই বুঝান হইয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ উহা বিশ্বাসও করিয়াছে।

আয়র্লণ্ড উক্তবিধ মূলনীতিগুলির জন্যই নিজে ক্ষুদ্র হইয়াও জাতিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে কিন্তু তোমরা আয়র্লণ্ডবাসীর উপর নৃশংসতা ও পাশবিকতার এরূপ এক বিকট দানবকে প্রেরণ করিয়াছ যে তাহার ফলে সমগ্র সভ্যজাতি তোমাদের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রকৃত ভদ্র ইংরাজের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

বাহুবলে আমাদিগকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া তোমাদের কর্তারা বৈঠক আহবান করিয়া, গলাবাজিও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা, আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নিজদেশের ন্যায্য অধিকার ত্যাগের সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু কর্তাদের কার্য্যের জন্য তোমরাই দায়ী। আসন্ন ভীষণ যুদ্ধের ভয় প্রদর্শন করাতে আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ দেশবাসীর বিনা অনুমোদনে শ্রেষ্ঠ অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তোমাদের শেষ প্রস্তাব এবং তাহাতে অসম্মত হইলে যাহা ঘটিবে তাহা আপন দেশের কর্তৃপক্ষ ও সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবার সুযোগও প্রতিনিধিগণকে দেওয়া হয় নাই।

এক্ষণে তোমাদের কর্তারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ভীতি প্রদর্শন সত্বেও আয়র্লণ্ডের আত্মসমর্পণে বাধা দিবার যথেষ্ট লোক বর্ত্তমান আছে। আইরিশের জাতীয় অধিকার চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে কোনও আয়র্লণ্ডবাসীই চাহে না, তাই আমাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার ভয় দেখান হইতেছে।

আমরা তোমাদের সহিত শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছি; তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইলেও তাহাতে আমরা সম্মত আছি কিন্তু এই তথাকথিত সন্ধিপত্র অনুসারে নহে। তোমরা জলপথে বিপদের আশঙ্কা কর তাহা আমরা জানি, সে পথে তোমাদের কোনও বিপদ ঘটিবে না এবিষয়ে অঙ্গীকারও করিতে পারি, কিন্তু তোমাদের রাজাকে আমরা রাজা বলিয়া স্বীকার করিব ইহা তিনি আশা করিতে পারেন না এবং আমরা তাহা স্বীকারও করিব না। তোমাদের অপেক্ষা বহু প্রাচীন একটি জাতিকে যে তোমরা উপনিবেশ শ্রেণীতে স্থান দিবে তাহা আমরা সহ্য করিব না, আর সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং যাহারা সীমা নির্দ্দেশ

করিয়া দিয়াছেন সে দেশকে তোমরা যে ইচ্ছানুযায়ী বিভাগে বিভক্ত করিবে ইহাও হইতে দিব না।

তোমরা শুনিয়াছ আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোক তোমাদের সন্ধি সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু একথা সত্য নহে।

আয়র্লণ্ডের অধিবাসীবৃন্দকে স্বাধীন অভিমত স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিতে দিলে তাহারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিবে এবিষয়ে, অনিচ্ছায় হইলেও, তোমাদের লয়েড্ জর্জ্জ সাক্ষ্যদিতে পারেন। বর্ত্তমানে স্বাধীনমত প্রকাশের স্বাধীনতা তাহাদের নাই। নির্য্যাতিত, যুদ্ধশ্রান্ত আইরিশ জাতি যে তোমাদের "সভ্যতার উপকরণের নমুনা দেখিতে অসম্মত হইয়া আসন্ন ভীষণ যুদ্ধ এবং তোমাদের প্রদত্ত সন্ধিসর্ত্ত এ উভয়ের মধ্যে সন্ধিসর্ত্তটিই গ্রহণ করিয়াছে ইহাতে বুঝিতে হইবে পরিণামে তোমাদের এই 'সন্ধি' তোমাদেরই সর্ব্বনাশ সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে।

বার্ক বলিয়া গিয়াছেন "অত্যাচারীর কথার ভঙ্গি সর্ব্বত্রই এক—'স্বাধীন ভাবে থাকিতে চাহিলে তোমরা নিরাপদ থাকিবে না"' আজ অর্থবল ও সৈন্য-বলের সাহায্যে আমাদিগকে এই সন্ধি স্বীকার করাইতে চাওয়ার প্রতিফল তোমরা পাইবেই। বলাধিক্য বশতঃ তোমরা হয়ত আমাদিগকে পরাজিত করিতে পার কিন্তু সে পরাজয় তোমাদের সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করিবে। আয়র্লণ্ডের জয় পরাজয় উভয়ই যে সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের সহায়ক হইবে এ বিষয়ে বহু সংবাদ পত্রই একমত।

আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোকই তোমাদের সন্ধিসর্ত্ত পালনে এবং 'ফ্রিষ্টেটের' গঠনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আয়র্লণ্ডের কতকগুলি লোক যে তোমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়াই থাকিবে একথা ধ্রুবসত্য। ইংলণ্ড যখনই কোন অসুবিধায় পড়িবে তখনই এই শ্রেণীর লোকগুলি তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে। তোমরা যখন আবার যুদ্ধে বিব্রত থাকিবে তখন আয়র্লণ্ডে ১৯১৬ সালের পুনরভিনয়—ঘটিবে এবং তাহার ফল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভীষণ হইবে। তোমরা হয়ত আশা কর যে এরূপ ঘটিলে আর্থার গ্রিফিথ্ * বা মাইকেল কলিন্স জন্ স্মাট্সের ন্যায় আচরণ করিবেন কিন্তু মনে

* এই পত্র প্রকাশিত হইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই আর্থার গ্রিফিথের মৃত্যু হইয়াছে। মাইকেল কলিন্স অল্পদিন হইল গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

রাখিও সেরূপ করিতে চাহিলে ১৯১৬ সালের জন্ রেডমণ্ডের যে দশা ঘটিয়াছিল তাঁহাদেরও সেইরূপ ঘটিবে।

আয়র্লণ্ডকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বশীভূত রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতে চাহিলে বা বলপূর্ব্বক আইরিশবাসীর নিকট হইতে রাজভক্তি আদায় করিতে গেলে যতটুকু পরাধীনতার ভাব মনে জাগে, ততটুকু বর্ত্তমান থাকিতে আমাদের উভয়জাতির মধ্যে শান্তিস্থাপন সম্ভব নহে। আমরা যাহা দিতে পারি না তাহা চাহিও না, তাহা হইলেই আমাদের স্বাধীনতা লাভে তোমাদের ভয়ের কোনও কারণই থাকিবে না।

তোমাদের কবলে পতিত একজন লিখিয়াছে "প্রতিবেশী হিসাবে আমরা উত্তম বটে কিন্তু শত্রুহিসাবে আমরা অতি ভীষণ।" আমাদের শত্রুতার ভীষণতার পরিচয় তোমরা ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছ, আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভ না করা পর্য্যন্ত আমরা সেইরূপই থাকিব এবং তদনুরূপ আচরণও করিব। স্বাধীনতা আমাদে চাই-ই, যতপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতেই হউক না কেন, স্বাধীনতালাভ করিতেই হইবে। আমাদিগকে অধিকতর কষ্ট দিবার ক্ষমতা তোমাদের আছে তাহা অস্বীকার করি না কিন্তু পরিণামে কাহাদের জয় ঘটে? যাহারা সর্ব্ববিধনির্য্যাতন সহ্য করে তাহাদের, যাহারা উহা প্রয়োগ করে তাহাদের নহে।

তোমাদের কর্ত্তারা যে আমাদের দেশকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন সে সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলি। তোমাদের এ কার্য্য আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। বেলজিয়ম্ আয়র্লণ্ডের তুলনায় নূতন দেশ, সেখানকার অধিবাসীরও এতদূর একতাসূত্রে গ্রথিত নহে কিন্তু তোমরাই স্বীকার কর যে সেখানে এরূপ চলিতে পারে না। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যও এরূপ ব্যবহার সহ্য করে নাই। আয়র্লণ্ড-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আয়র্লণ্ডের আপত্তিই লিঙ্কলন্ যুদ্ধের হেতু, বিদেশীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ইংলণ্ডের নিকট আয়র্লণ্ড অপরাধী হইয়াছিল বলিয়া সে যুদ্ধ ঘটে নাই।

তোমরা যাহাকে Six Couuty Area আখ্যা দাও সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী অন্ত আইরিশগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবে তোমাদের এ আশঙ্কা অমূলক। তোমাদের কর্ত্তারা তাহাদিগকে চিন্তা প্রণালী ও কার্য্য প্রণালী উভয় বিষয়েই পৃথক্ রাখিয়া প্রাচীন ভেদনীতি অবলম্বন দ্বারা আমাদিগকে জয় করিতে চাহেন। ঐ সব দারিদ্র্য পীড়িত লোকগুলির গোঁড়ামি সত্ত্বেও তাহারা

নিতান্তই সংস্বভাবাপন্ন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের মনের ভাব এখনও অত্যাচার পীড়িত সপ্তদশ শতাব্দীর ন্যায়। কিন্তু লর্ড বার্কেন হেড, কার্সন প্রমুখ ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কগণ তাহাদের এই সবল নিষ্ঠার সুযোগ পাইয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসাধন করিয়াছেন, পর পর কয়েকটি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাই আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনার্থ বেলফাষ্ট ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিকে আয়র্লণ্ডের রাজনৈতিক দেহের ক্ষতে পরিণত করিয়া রক্ষা করিতেছেন।

বেল্‌ফাষ্টের বর্ত্তমান অবস্থারদিকে দৃষ্টিপাত কর। যাহাতে 'দুর্ব্বৃত্ত' আইরিশগণকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য এদেশে প্রেরণ করিবার উপলক্ষ পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের কর্ত্তারা বেলফাষ্টের এই অবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাদের নৃশংসতা সভ্যতার ইতিহাসের কলঙ্ক সেই সব 'স্পেশাল' সেনানীদের পোষণার্থ তোমাদের অর্থব্যয়িত হইতেছে। যখন এই সব নরপশু স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে হত্যা করে তখন তোমাদের পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণও সেই সব দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখে আর তাহাদের কবলে পতিত সেই মানুষগুলি যদি 'মরিয়া' হইয়া কখনও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে তখন ঐ সব নৃশংস নরপশুর আদেশে তোমাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ "সভ্যতার উপকরণের" সহায়তায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়।

ইংলণ্ডের গণতন্ত্র কি নীরব থাকিবে? একটি জাতি ন্যায্য স্বাধীনতা লাভে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে প্রচেষ্টাপরায়ণ পাশবিকতার বিরুদ্ধে কি আত্মসম্মানবোধবিশিষ্ট ইংরাজ সন্তানের কণ্ঠ ধ্বনিত হইবে না? তোমরা বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছ কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এখন শান্তির প্রকৃষ্ট পন্থা ন্যায়ের পথ ধর, তাহা হইলে বহু শত বৎসরের শত্রুতার তিরোহিত হইবে। তোমাদের কর্ত্তারা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত না করিলে আয়র্লণ্ড তোমাদের প্রনষ্ট গৌরবের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিবেই। তাহারা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র তোমাদের শত্রুদিগকে সাহায্য করিবে এবং তোমাদের সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবে। তোমাদের অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসম্ভার সত্ত্বেও আয়র্লণ্ড আপন অভীষ্ট লাভ করিবেই। রোম ও কার্থেজের সৈন্যবল আজ কোথায়? কিন্তু যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তাহারা বিনাশ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আজিও জীবিত থাকিয়া নবীন জাতিগুলিকে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

নারায়ণের নিকষমণি

হিন্দী শব্দ ও অনুবাদমালা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত শাস্ত্রী ও শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, কলিকাতা ৩০নং গোবিন্দ ঘোষালের লেন্ ভবানীপুর 'হিন্দী প্রচার কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা। ইহা "সরল হিন্দী শিক্ষার" সঙ্গে সঙ্গে পড়িবার জন্ম প্রথম হি [illegible] নক্ষ্যার্থীর জন্ম রচিত। ইহাতে প্রথমে হিন্দী পরে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রচারিত হইয়াছে; ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই হিন্দী শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দী শিখিবার এমন সহজ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক আর নাই।

প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা—শ্রীসন্তোষ নাথ শেঠ সাহিত্য রত্ন প্রণীত, চন্দনগর হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২॥০ টাকা এই পুস্তকখানি স্কুল, কলেজ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের ব্যবসা শিক্ষার জন্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এমন সরলভাবে ব্যবসার, কথা লিখিয়া গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আশা করি বঙ্গের প্রতি স্কুল ও জাতীয় বিদ্যালয়ে এই পুস্তকখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইবে।

পথস্মৃতিই—শ্রীসুধীরকুমার ভাদুড়ী প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা। পুস্তক খানতে কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের এতটা ধোঁয়া জমিয়া আছে যে তাহা হইতে উহার আসল রূপের পরিচয় পাইলাম না।

সুবলসখার কাণ্ড—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত ও রায় এণ্ড রায় চৌধুরী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৶০। দীনেশবাবু বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা গল্পচ্ছলে লিখিয়া বাঙ্গালী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। লিখন ভঙ্গী চমৎকার, ভাষা সরল, এবং গল্পাংশ মনোরম। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা] [আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৯

অন্তর্ধান

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

শুক

শারদ রজনী যবে পরি মল্লীফুলহার
পড়িল নয়ন-পথে, স্মৃতিপটে বার বার
জাগিল অতীত চিত্র। ব্রজ-বধূ সহ মরি
বিপিনে রমণ লাগি আকুল হইলা হরি।
আপ্ত-কাম ভগবান্, তবু তাঁর চিত্ত মাঝে
আবরিয়া অভিমান প্রেম যোগমায়া রাজে

২

রমণ-বাসনা জাগিল যেমতি
অমনি উদিল তারাদল-পতি
অম্বর আলোকিয়া;
বহুদিন পরে বঁধুর সদন
বঁধুয়ার মত করি আগমন
অরুণিম করে পূরব আশার
ধরিয়া মুখানি দিল বার বার
কুঙ্কুমে বিলেপিয়া।
পরশন-সুখে পুলক-বিবশা
হ'ল দিগ্বধূ, দরশে সরসা
ধরার তপ্ত হিয়া।

৩

কুমুদ্বিকাশী কুঙ্কুম-রুচি
নেহারি পূর্ণ চন্দ্রমা শুচি
রমানন-আভাময়,
হেরিয়া চাঁদের কোমল কিরণে
রঞ্জিত বন, মাধবের মনে
স্মৃতির লহর বয়।
সুলোচনা যত গোপীর পরাণ
করিতে হরণ কি মধুর গান
মুরলীতে ফুকরয়।

৪

কৃষ্ণ-চরণ-চর্চ্চিত-মনা
গোকুলের যত কুল-অঙ্গনা
আছিল ভবন মাঝে,
মদন-দীপন শুনি বেণু-গান
ধায় দ্রুতপদে পাগল পরাণ
ভেটিবারে নটরাজে।

কে গেল কখন কেহ না লখিল
আকুল-পরাণে সকলি ছুটিল
কান্ত যেখানে রাজে ;
গমনের বেগে চল-চঞ্চল
কুন্তল কাণে করে ঝলমল
কঙ্কণ করে বাজে।

৫

যেমতি বাঁশীর গান পশিল গোপীর কাণে
অমনি ছুটিল গোপী গৃহ-কাজ নাহি মানে,
যে ছিল দোহন-রতা দোহন ছাড়িয়া ধায়
দুগ্ধ-আবর্ত্তন-রতা নাহি রহে প্রতীক্ষায়।
কেহ বা রন্ধন ফেলি ধাইল কানন-পথে
পতি-সেবা ছাড়ি কেহ চলে চাপি মনোরথে।
কেহ বা শিশুর মুখে দিতেছিল স্তন-সুধা
অমনি ছুটিল বালা ভুলিয়া শিশুর ক্ষুধা।
কেহ বা করিতেছিল গোপগণে পরিবেশ
ফেলিয়া হাতের থালা ধায় আলুথালু বেশ।
কোন গোপী অন্তঃপুরে বদনে তুলিতে গ্রাস
বেণু-রবে আত্মহারা চলিল বঁধুর পাশ।

৬

চন্দনে লেপিতেছিল কেহ চারুঅঙ্গ তার
মার্জ্জনা করিতেছিল কেহ তনু-লতিকার
কেহ দিতেছিল তার লোচনে কাজল-রেখা
বাঁশী শুনে উন্মাদিনী ধায় বন-পথে একা।
মুরলীর সুর-মোহ মরমে রচিল ভুল
কটীর মেখলা গিয়া চুমিল হৃদয়-মূল।

৭

গোবিন্দ গোপীর আত্মা হরণ করিল বলে
কে আর বাঁধিবে তারে গৃহ-কোণে কোন্ ছলে ?

বিমোহিত বেণু-স্থরে বালা বন-পথে ধায়
ভাই বন্ধু পিতা পতি ফিরাতে না পারে তায়।

৮

ঘরের বাহির হ'তে পথ না পাইল যারা
প্রাণের ভিতরে পশি হায় অভাগিনী তারা
ভুলি গৃহ-অবরোধ স্মরি কৃষ্ণ অভিসার
বঁধুরে ধেয়ায় মনে মুদিয়া নয়ন-তার।

৯।১০

যিনি পরমাত্মা যিনি কোটী ব্রহ্মাণ্ডের পতি
গৃহ-বদ্ধা গোপীগণ পুষি হৃদে জার-মতি
বাহ্যজ্ঞান ভুলি সবে ধেয়ায় তাঁহার মুখ,
জলন্ত বিরহানলে ভস্মীভূত স্থখ দুখ,
শুভাশুভ দ্বন্দ্ব টুটে; নিগূঢ় সে চিন্তামাঝে
অচ্যুতের আলিঙ্গনে কি সান্দ্র আনন্দ রাজে!
বঁধুর মূরতি-ধ্যানে বন্ধন খসিয়া যায়
পঞ্চভূতময় দেহ বাঁধিতে না পারে তায়।

১১

পরীক্ষিত

বুঝিতে নারিনু মুনি! তোমার মরম আমি;
যিনি ব্রহ্ম জগদাত্মা তত্ত্ব নাহি তার জানি
কান্তবোধে সেই কৃষ্ণে আসঙ্গের বাসনায়
যে ব্রজরমণীকুল ধেয়াইল নিরালায়
কেমনে তাদের চিতে ব্রহ্মানন্দ বিভাসিল?
কেমনে গুণের ধ্যানে গুণ-স্রোত বিরামিল?

১২

শুক

বিস্ময়ের কিবা হেতু? কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল
বলেছি তোমারে বৎস বিস্তারি বিদ্বেষ-জাল

বাঁধিল সে হৃষীকেশে। তবে কেন ব্রজবালা
নিশিদিন কৃষ্ণ-প্রেম চিত্ত যার করে আলা
না বাঁধিবে তাঁরে যিনি ইন্দ্রিয়-বন্ধন-হীন,
ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে রসরূপে সমাসীন ?

১৩

অব্যয় হইয়া তিনি করিবারে আত্ম-দান
অসীম হইয়া তিনি ল'য়ে সীমা-পরিমাণ
নিগুর্ণ হইয়া গুণ করিবারে প্রবর্ত্তন
সাধিতে জীবের শুভ অবতীর্ণ নারায়ণ।

১৪

নর-দেহী নিত্য যদি হৃদয়ের সর্ব্বকাম
সর্ব্ব রোষ সর্ব্ব ভয় সর্ব্ব স্নেহ অবিরাম
সর্ব্ব ঐক্য মৈত্রীমাঝে একমাত্র ভাব ধরি
হরি-চিন্তা করে সার, তাহার অন্তর ভরি
আত্মালোকে, আত্মারাম আপনি উদিত হন,
তন্ময় হইলে ঘটে চিন্ময়ের দরশন।

১৫

যিনি অ-জ ভগবান্, যোগেশ্বর ভজে যাঁয়,
স্থাবর জঙ্গম লভে মুক্তি যাঁর করুণায়,
চিন্তামণি-চিন্তা-রত জীবের বন্ধন আর
মোচন করিতে বৎস লাগিবে কি ভয় তাঁর ?

১৬

শুন এবে নৃপ! কাহিনী আমার;
মধু হ'তে মধু বচন যাঁহার
সেই রসরূপী ভগবান্
ব্রজগোপীগণে নেহারিয়া পাশে
বিমোহিয়া সবে সুচতুর ভাষে
কহিতে লাগিলা কান।

কৃষ্ণ

১৭

এস এস বরজের সুভাষিনীগণ!
কহ মোরে কি করিব?
কেন আগমন?
বদনে ভয়ের ছায়া কেন সবাকার?
ব্রজের কুশল কিনা? কহ সমাচার।

১৮

কি হেতু নীরব রহ, মুখে মৃদু হাস?
রজনী বিপদ-ঘোরা; নিশাচর-বাস
এ ঘোর কানন নহে অবলার ঠাঁই;
ফিরে যাও ব্রজধামে আমার দোহাই।

১৯

পিতা মাতা পতি পুত্র ভাই বন্ধুজন
তোমাদের অদর্শনে চিন্তাকুল-মন।
ফিরে যাও ব্রজবালা ব্রজের মাঝার,
নাহি কি লো লাজভয়
প্রাণে সবাকার?

২০। ২১

হে ব্রজ-সুন্দরীগণ! ফিরায়ে নয়ন
কি দেখিছ? হেরিছ কি
কেমনে কানন
হাসিতেছে পূর্ণিমার জোছনার ফুলে,
কুসুমিত তরুলতা উঠিতেছে দুলে
যমুনা-শীকর-সিক্ত মৃদুল পবনে?
এসেছিলে বুঝি বনশোভা দরশনে
এ ফুল্ল চাঁদিনী রাতে? ফিরে যাও তবে
ঘোষ-পল্লীমাঝে ওগো পল্লী-সতী সবে,
দ্রুতপদে—যেথা তব সেবা অপেক্ষায়
আছে পতি পথ চাহি আকুল হিয়ায়,
যেথা গাভী চঞ্চলিছে দোহন-কারণ,
হাম্বালিছে বৎস, শিশু করিছে ক্রন্দন।

২২

ক্ষুব্ধ কি বচনে মম? ক্রোধ কর দূর;
বুঝিনু—আমার প্রতি স্নেহ সুমধুর
যন্ত্রসম তোমা সবে করি আকর্ষণ
কাননে আনিল আজি।
কি দোষ তাহার?
কে হেন জগতে যে লো
নাহি মোরে চায়?

২৩

সত্য বটে। কিন্তু শোন হে কল্যাণীগণ!
অকপটে পতি-সেবা সন্তান-পালন
নারীর পরম ধর্ম্ম। করে যদি আশ
কুল-বধূ মৃত্যু-পারে পতিলোকে বাস,
হোক্ পতি অনাচারী ব্যাধি-জরজর
ভাগ্যহীন ধনহীন বৃদ্ধ কিংবা জড়,
তবু না ছাড়িবে নারী জীবনে তাহার
স্বামী-সঙ্গ যদি পতি নহে পাপাচার।

২৪

কিন্তু যেই কুলনারী ছাড়ি নিজ পতি
এ জগতে ভোগ-সুখে ভজে উপপতি,
সেই তার অতি তুচ্ছ নিন্দিত আচার
পদে পদে কণ্টকিয়া জীবন তাহার
ভুবন অযশে ভরে, মরণের পর
রুদ্ধ করে স্বর্গ-পথ,—কিবা ভয়ঙ্কর!

২৫

আর শুন—যদি পুন গাঢ় অনুরাগ
আনিল সবারে টানি মম পুরোভাগ

এ নিশায়, এই মাত্র মম নিবেদন ;
অচিরায় গৃহ মাঝে করহ গমন।
জান নাকি দূর হতে শ্রবণ দর্শন
অন্তরের অনুধ্যান গুণানুকীর্ত্তন
উৎকণ্ঠায় করে যেই ভাবের সঞ্চার,
মিলন না দিতে পারে কণা মাত্র তার ?

শুক।

গোবিন্দের কর্ণশূল বচন নিচয়
বিদ্ধিল গোপীর প্রাণ, ভাঙ্গিল হৃদয়
কৃষ্ণ-অঙ্গ-সঙ্গ-সুখ-আশা-অবসান,
ভাবিতে লাগিল সবে বিষণ্ণ-পরাণ।

২৬

আহা গোপী যত গুরু দুখ ভরে ঘন ঘন ফেলে শ্বাস,
শুকাইল চারু বিম্ব-অধর, মুখানি মলিন পাশ।
অবনত করি বদন কমল
চরণাঙ্গুলে লিখে ক্ষিতিতল,
কজ্জল-ধোয়া অশ্রুলহর
কুচতট পরে ঝরি ঝর ঝর
কুঙ্কুম-রাগ করিছে তরল, আননে না সরে ভাষ,
সহসা ক্ষোদিত পাষাণ-মূরতি বনে যেন পরকাশ!

২৭

বঁধুর লাগিয়া হৃদয়ে তাদের পিরীতির নাহি ওর,
বঁধুরে স'পিল সকল কামনা ছিন্ন করিয়া ডোর।
সেই সে বঁধুয়া পরাণের পিয়া
নিঠুর বচনে পীড়িল রে হিয়া,
স্মরণে দারুণ আসি অভিমান
অশ্রু লহরে পূরিল নয়ান,
মুছিয়া রোদন অন্ধ লোচন সম্বোধি প্রাণ-চোর
কহিল ঈষদ প্রণয়ের কোপে গদ গদ করযোড়।

২৮

গোপী।

ওগো গোপিকার প্রাণ-বল্লভ! এমন নিঠুর বাণী
ঘাতকের মত কেমনে হানিলে বধিতে অবলা প্রাণী ?

সব তেয়াগিয়া আইনু আমরা তোমার চরণতলে
চাতকী যেমতি ধায় মেঘ পাশে পিয়াসা মিটাতে জলে।
আমরা তোমার চরণের দাসী শরণ লইনু পায়,
বিষ বরষিয়া শ্যাম জলধর ! বধিয়োনা অবলায়।
শুনেছি পুরাণে পরম পুরুষ ভকতে না ছাড়ে তার
তুমিলো মোদের পরাণ পুরুষ, গ্রহণ তোমার ভার।

২৯

ধরম মরম জানিয়ে আপনে মো সবে কহিলে বঁধু !
'ধরম নারীর পতি সুতাদির অনুরতি সেবা শুধু।'
জানিয়াছি সার তুমি ত সবার পরাণ-বন্ধু হও
জগতের যত জীব-দেহ মাঝে আত্মা রূপে যে রও।
তোমারে সেবিলে পতি সুত আদি সকলের সেবা হয়
তরুমূলে যথা সলিল-সেচনে শাখাদি সরস রয়।
তোমার মাঝারে মোদের জগৎ, জগত মাঝারে তুমি,
না ঠেল চরণে, তুমি যে তোমার নিজ উপদেশ-ভূমি।

৩০

জগতে যাহারা করম-কুশল, জানি তোমা নিতি-প্রিয়
আত্মা-রূপী হে ! তোমাতে তাহারা রমে চির রমণীয়।
কণ্টকরূপী পতি সুত আদি বিঁধে সদা পায় পায়,
তোমারে ছাড়িয়া তাদের ভজিতে পরাণ নাহিক চায়।
তুমি ত সবার বাসনা পূরাও, বাসনা জাগায়ে প্রাণে
নিঠুরের মত চরণে দলিয়া ফিরাতে চাহিছ ক্যানে ?
চিরদিন ধরি যে আশালতিকা বাড়িল হৃদয়ে মোর
কুসুমিত কালে কমল-লোচন ! ছিঁড়োনা তাহার ডোর।

৩১

বঁধু হে ! তোমারে কই ?

যে মন আছিল ঘরের ভিতর আমার সে মন কই ?
কি বাঁশী বাজালে ভবন ভুলালে পরাণ করিলে চুরি,
পুতলীর মত কাননে আইনু যেমনি টানিলে ডুরী।

গৃহ-কাজে মন আর না ফিরিবে
গৃহ-কাজে কর আর না উঠিবে
ঘরের বাহির করিয়া সবারে চরণে জড়ালে ফাঁসী,
তব পদ-মূল ছাড়িয়া চরণ
এক পদ আর না করে গমন,
অকূলে ভাসিয়া গোকুলে এখন কেমনে ফিরিবে দাসী ?
কি করিয়ে আর অধীনা তোমার কহ লো মরম-বাসী !

৩২

পরাণ বঁধু হে ! শুন !
তোমার মধুর হাসিটি হাসিয়া
তোমার মধুর চাহনি চাহিয়া
তোমার মধুর বাঁশীটি বাজিয়া
হিয়ার মাঝারে দিলরে জ্বালিয়া
সুপ্ত হুদয়াগুণ [অ] ।
বরষি তোমার অধর অমিয়া
নিভাও,—নহিলে তাহে যোগ দিয়া
বিরহ-অনল যাবে দগধিয়া
এ দেহ, তোমাতে রহিবে লাগিয়া
নারী-বধ-দোষ পুন ।
তোমারি কারণ ত্যজি এ জীবন
তোমারি ধেয়ানে তরিয়া মরণ
আবার ভিড়িব তোমার সদন,
জীবন মরণ মালার মতন
জড়াবে চরণারুণ [অ] ।

৩৩

বৃন্দাবন-রমণ তুমি, তোমার পদতল
(যাহার রেণু রমারো বুকে হরষ করে দান)
ছুঁয়েছি যবে, পরশমণি-পরশে নিরমল
লোহার দেহ হয়েছে সোনা অম্বু-জ-নয়ান !

চরণ তব যাহারে দিল পুলক-শিহরণ,
সঙ্গ তব যাহারে নিল সুখের পরিসীমা,
কেমনে সেই অঙ্গ মম অপর-পরশন
সহিবে কহ অবলা মোরে সহজে বোধ-হীনা ?

৩৪

তোমার চরণ সরোজ-রজ
তুলনা নাহিক তার
তুলসী বসিয়া চরণ-তলে
মাথে গায় বার বার।

সুর-বাঞ্ছিতা আপনি কমলা
বক্ষে তোমার বসিয়া নিরলা।
তুলসীর মত চাহে অনুখণ
তব অনুচর-সেবিত-চরণ
রেণুতে লোটাতে শির ;

আমরা তোমার চরণের দাসী
কেবল চরণ-ধূলির প্রয়াসী
সিঞ্চিব দিয়া নয়নের নীর [অ],
বঞ্চিত তাহে করিয়োনা চির-
বাঞ্ছিত রমণীর।

৩৫

(ওগো) অন্তর-তাপ-হারী !
তোমারে ভজিব বড় আশা করি
ছাড়ি ব্রজ-বাস এনু ত্বরাত্বরি
তোমার চরণ-মূলে মোরা হরি !
যতেক ব্রজের নারী।

ওগো গোপিকার অঙ্গ-ভূষণ !
নীলমণিময় পুরুষ-রতন ;
হাসিমাখা তব লোচন নিপাতে
জ্বালিলে হৃদয়ে এ শারদ রাতে
তীব্র কামনানল ;

সে আগুনে জলে সারা তনু মন,
লইনু শরণ শীতল চরণ,
দাসী ক'রে রাখ শ্রীপদে তোমার,
চরণ-সেবার দেহ অধিকার
গোপীর কাম্য ফল।

৩৬

বঁধুয়া ! তোমার ভুবন মাঝার রূপের নাহিক ওর !
কেনা নারী চায় দাসী হ'তে পায় ও রূপে হইয়া ভোর ?

তোমার মধুর মোহন সুহাস
অমিয়া নিছনি দিঠির বিলাস
ত্রিভঙ্গ ঠাম লাবণি-বিকাশ
মরমে পশিয়া
সিঁদ-কাটি দিয়া
হরিল হৃদয় মোর।

কুণ্ডল কানে করে ঝলমল
গণ্ডে তুলিছে নৃত্য চপল
সুধার অধর রসে টলমল
অলক-আবৃত
ও চাঁদ-বয়ান
জাগায় পিয়াসা ঘোর।

ওই ভুজ যুগ শঙ্কা-হরণ,
বক্ষ-রমার রমণ-সদন,
মুগ্ধ করিয়া মম তনু মন
লুব্ধ করিছে
কিঙ্করী হ'য়ে
লুটাতে চরণে তোর।

৩৭

এমন নারী কে বা আছে গো ত্রিভুবনে
বঁধু হে!
দীরঘ-মূরছনা-মধুর-পদ-যুত
পিয়ি যে তব বেণু-বদন-বিগলিত
মধু হে,
ভুবন-মনোহর নেহারি রূপরাশি,
ধরম নাহি ছাড়ে যায় না সোতে ভাসি
অকূলে?
বিশ্ব-বিমোহন ও রূপে বিমোহিত
বিহগ ধেনু দ্রুম কুরগ পুলকিত,
চপল কেন তবে হবে না গোপী-চিত
গোকুলে?

৩৮

তুমি লো আদি পুরুষ বর
চতুর্ভুজ সুর-নগর
তারিতে তনু ধরিলে কত বার;

এবার ব্রজ-আর্ত্তি-হর
দ্বিভুজ তুমি মুরলীধর
জনম নিলে নন্দ-পরিবার।
আর্ত্ত জন বন্ধু তুমি,
মিনতি করি ভূতল চুমি
চরণে শুন দাসীর নিবেদন ;
দেহ গো মম মাথার পরে
তপ্ত মম এ পয়োধরে
শীতল তব করের পরশন।

৩৯

শুক।

যোগেশেশ্বর যিনি
আত্ম-রমণ যিনি
আপনে আপনি পরিপূর্ণ,
ব্রজবধূগণ মুখে
শুনি বিহ্বল বাণী
হৃদয় হইল শত চূর্ণ।

মরম করুণা-ভরা
অধর মধুর হাসি
তুষিল গোপীর মন তূর্ণ,
আপনা করিয়া দান
রাখিল গোপীর মান
তুলিল রমণ রস-ঘূর্ণ।

৪০

রমণ-কলা-কুশল মরি
চ্যুতি-রহিত চপল হরি
মিলিল আসি মিলনাতুরা রমণীগণ মাঝ ;
মধুর হাস শুভ্রশুচি
কুন্দ জিনি দন্ত-রুচি
অমিয় ঝরে লোচন হ'তে রমণরসরাজ।
বঁধুর পানে ব্রজাঙ্গনা
চাহে দরশ-ফুল্লাননা
পলক-হীন নয়ন-তারা বদনে বাঁধা রয় ;
যেন রে পূর্ণিমার চাঁদে
তারকাবলী দিঠির ফাঁদে
জড়িয়ে রাখে গগন মাঝে কিরণে মধুময়!

বণিতা শত যুথের মাঝে যেন রে যুথ-পতি
করিছে বিহরণ,
গায়িছে কভু আপনি হরি, মুগ্ধ ঘন-রতি
কখনো গোপীগণ !
যমুনা-তটে পশিলে কালা
দিল বৈজয়ন্তী মালা
দুলায়ে বঁধু-গলে
হিম-বালুকা-তট-শালিনী
তপন-সুতা বন-তোষিণী
লুটাল পদ তলে।
দূয় কুমুদ-গন্ধ-বহ
যমুনা-জল-কণিকা সহ
মন্দ সমীরণ
তুষিল ব্রজ-নাথের হিয়া
শীতল তার পরশ দিয়া
অঙ্গ-বিনোদন।

৪১

কখনো বঁধু পসারি বাহু
উরসে দিল আলিঙ্গন,
কখনো করে বাঁধিয়া কর
বিহরে চারু কুঞ্জবন।

অলক কভু এলায়ে দিয়া
শিথিলি নীবীবন্ধ,
নিঠুর নখে নিষ্পীড়িয়া
গোপীর হৃৎ-পদ্ম,

অ'লখে গুরু উরুর পর
কখনো রাখি কমল কর,
কখনো হানি' কটাখ-বান
হাসিতে হরি চিত্ত-মন,

রমণ-রসে মর্ম্ম ভরি
রমণী-যুথ সহিত মরি
মর্ম্ম কেলি করিল হরি
উলসি' মধু বৃন্দাবন।

৪২

সকলের আত্মা যিনি
রস-রূপী ভগবান্
সেই কৃষ্ণ হ'তে লভি
এইরূপে বহুমান
গোপীদের চিত্ত মাঝে
অভিমান সঞ্চারিল,
সবা হ'তে সুভাগিনী
আপনারে বিভাবিল।

৪৩

গোপীর গরব মান	অন্তরে বুঝিয়া হরি
সে গর্ব্ব করিতে চুর,	সে মানে হৃদয় ভরি
প্রসাদ বাঁটিয়া দিতে,	জ্যোতির্ম্ময় তনু তাঁর
লুকাইলা অকস্মাৎ	নেত্র করি' অন্ধকার।

অপরাধ তত্ত্ব

[শ্রীশান্তিকাম]

১ম দৃশ্য—বাজার।

সুবোধ। ম'শায়, বিলিতী কাপড় কিনবেন না।

সুধীর। ঐ যে, ঐ দোকানে দেশী কাপড় আছে, তাই কিনুন না?

মঙ্গল রাম মারওয়াড়ী। তুম লোগ কোন হ্যায়? ইঁহাসে চলা যাও।

বালকদ্বয়। আচ্ছা, যাচ্ছি। (একটু সরে গিয়ে) বিলিতী কাপড় কেউ কিনবেন না।

বালক দুটির অল্প বয়স ও সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে এবং মিষ্ট কথা শুনে পাঁচ সাতজন জমে গেল। একটু দূরে একজন কনষ্টবল দাঁড়িয়ে ছিল, সেও সেখানে এসে উপস্থিত হল। একটু পরে আরও দুজন কনষ্টেবল এল। সে দিন থানায় চৌকিদারদের হাজরি ছিল, পাঁচ সাতজন চৌকিদারও এল। তামাসা দেখতে বাজারের নিষ্কর্ম্মা লোকও দু'চার জন এল। সংবাদটা পরিবর্ত্তিত ও

পরিবর্দ্ধিত হয়ে টাউন আউট-পোষ্ট জমাদারের কাছে পৌছল। জমাদার কাল বিলম্ব না করে; দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে সেখানে গেলেন এবং বালক দুটিকে ধরে নিয়ে প্রথমে আউট-পোষ্টে তারপর থানায় গেলেন।

২য় দৃশ্য—সবডিভিসনাল অফিসারের বাড়ীর বৈঠকখানা।

মিঃ এন, এল, ঘোষ ওরফে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ সবডিভিসনাল অফিসার। দেশের রীতি অনুসারে তিনি একাধারে শাসক ও বিচারক হলেও বিচার কার্য্যের চেয়ে শাসন কার্য্যে তাঁর প্রতিপত্তি বেশী। সে দিনEmpire Day কাছারী বন্ধ। সবডিভিসনাল অফিসার বাড়ীতেই আছেন। বিভীষন সিং ও মহাবীর সিং, দুই কনষ্টেবল আড়াই ইঞ্চ মোটা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং এক এক সের ওজনের এক এক জোড়া হাতকড়ি হাতে লাগিয়ে, সুবোধ ও সুধীরকে সবডিভিসনাল অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত করে একখানা কাগজ তাঁর হাতে দিল। তাঁর একটি ছোট মেয়ে সেইখানে বসে ছিল, ছেলে দুটিকে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে "বাবা, এরা কি চোর ?" সবডিভিসনাল অফিসার বললেন "না, এরা চোর টোর নয়। কিন্তু তুমি বাড়ীর ভেতর যাও, তোমাদের এ সব কথা শোনবার দরকার নেই।" তারপর তিনি একজন কনষ্টেবলকে বললেন "কোর্ট বাবুকো বোলাও।" একজন কোর্ট বাবুকে ডাকিতে গেল, আর একজন বালক দুটিকে নিয়ে একটু দূরে বসল। এর মধ্যে সবডিভিসনাল অফিসারের মেয়েটি তার দাদাকে আর ছোট বোনকে ডেকে নিয়ে ছেলে দুটির দিকে যাচ্ছিল। সবডিভিসনাল অফিসারের ছেলেটি বলছিল "আমি ওদেরকে চিনি। যে দিন ওদের সঙ্গে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় করে নে না, ভাই' গাইতে গিয়েছিলাম।" সবডিবিসনাল অফিসারের কাণে এই কথা পৌছুতেই, তিনি ধমকে বললেন "আচ্ছা, তোমার আর ওদের চিনতে হবে না, এখন বাড়ী যাও।" ছেলে মেয়েরা বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

একটু পরে কোর্টবাবু এলে সবডিভিসনাল অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন "এরা অপরাধটা করেছে কি ?"

কোর্টবাবু। আজ্ঞে, ঐ রিপোর্টেই ত লেখা আছে, ছেলে দুটো বাজারে মঙ্গলরাম মারওয়াড়ীর দোকানের সামনে পিকেটিং করছিল।

সবডিভিসনাল অফিসার। সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাতে কোন্ আইনের কোন ধারার অপরাধ হয়, সেটা রিপোর্টে নেই।

কোর্টবাবু রিপোর্টটা হাতে নিয়ে বললেন "আমি থানা থেকে ওগুলো ঠিক করে লিখিয়ে এনে দিচ্ছি।"

থানায় গিয়ে কোর্টবাবু দেখলেন সেখানে ইনস্পেক্টর বাবু, সবইনস্পেকটার বাবু, সহকারী সব ইনস্পেকটার বাবু ও টাউন জমাদার একত্র বসে বসে ঐ বিষয়েরই আলোচনা করছেন। সব ইনস্পেকটার বাবুকে রিপোর্টটা দেখিয়ে কোর্টবাবু বললেন "এটা যে অসম্পূর্ণ রয়েছে, আইনের ধারাটা লিখে দেন।" শুনে জমাদার বললেন "বাবু, কলকাত্তামে কেতনা এই রকম মোকর্দ্দমা হচ্ছে, খবরকা কাগজমে লিখছে, আর আপলোগ কানুনের দফাটা জানছেন না?" সুযোগ্য সহকারী সব ইনস্পেকটার বললেন "ওরা ত ভলান্টিয়ার, বে-আইন জনতার লোক।" ইনস্পেকটার বললেন "নিশ্চয় জান ওরা ভলান্টিয়ার? কত জন ওরা ছিল?" সব ইনস্পেকটার বললেন "বোধ হয় ভলান্টিয়ার ওরা নয়। ওরা নেহাত ছেলে মানুষ ভলান্টিয়ার হবার বয়স হয় নি এখনও। আর মোটে দুজন বলেই ত শুনেছি।"

জমাদার। পঁচাশ যাট আদমী ছিল, বাবু। আর ওদের দলের ভি আউর ছোকরা লোগ ইধার উধারমে ছিল। হামি তাদেকে দেখেনি, লেকিন ছিল জরুর।

জমাদার বলী সিং অনেক দিন বাঙলা দেশে থেকে বাঙলা ভাষাটা এক রকম দখল করে নিয়েছিলেন।

সহকারী সব ইনস্পেকটার। যা হক একটা ধারা লাগিয়ে দেন, ওরা নিশ্চয়ই অসহযোগী, সাক্ষীদের জেরাও করবে না, সাফাইও দেবে না। সম্ভবতঃ কোন কথাই বলবে না।

এই রকম অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হল, সাধারণ লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করার ধারাটা লাগিয়ে দেওয়া হক। তাই হল, যদিও যে স্থানটায় ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা ঠিক পথ নয়, বাজার অর্থাৎ চারিদিকে কতকগুলি দোকান আর মাঝখানে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে হাটের দিন হাট বসে, লোকজন যাতায়াতও করে।

কোর্টবাবু সংশোধিত রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলেন। সবডিভিসনাল অফিসার হুকুম দিলেন আসামীরা প্রত্যেকে ৫০০৲ টাকার জামিন দেবে, না দিলে হাজত। আসামীরা জামিন না দিয়ে হাজতে গেল।

৩য় দৃশ্য—প্রবোধবাবু উকীলের বাড়ী।

প্রবোধবাবু। চুপচাপ বসে থাকুন। ও তে করবার কিছু নেই। হাকিমরা দেখেন আইনের মাহাত্ম্য আর শান্তি কিসে রক্ষা করা যায়। ঘটনার বৃত্তান্তে আইনের প্রয়োগ করতে কথার মার পেঁচ আর চুলচেরা তর্ক শোনবার অবসর হাকিমদের নেই। কাজেই আমাদেরও বলবার ওতে কিছু নেই। আপনার ছেলেকে বলে দেবেন হাকিমের কাছে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করে।

প্রবোধ বাবু যাকে এই উপদেশ দিলেন তিনি সুধীরের বাপ, তিনকড়ি দত্ত। তিনি কলকাতার কোন আপিষে চাকরী করেন। বাড়ী থেকেই রোজ আপিষে যাতায়াত করেন। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে, স্নান আহার তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে আধ ক্রোশ রাস্তা দৌড়ে গিয়ে ন'টার ট্রেণ ধরতে হয়; আবার আসবার সময় আপিষের কাজকর্ম্ম সেরে, বাজার করে, ক্রোশখানেক রাস্তা হেঁটে ষ্টেশনে এসে ছ'টার আগের কোন ট্রেণ ধরতে পারেন না। কাজেই সূর্য্যোদয়ের ঘন্টাখানেক আগে থেকে, সূর্য্যাস্তের ঘণ্টা দুই পরে পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীর কোন কাজকর্ম্মও দেখতে পারেন না। রবিবারে এবং ছুটির দিনে বাড়ীতে না থাকলে তাঁর ছেলে মেয়েরা বা পাড়ার লোক তাঁকে চিনতে পারত কি না সন্দেহ। সেদিন অপিষ থেকে এসেই সুধীরের কাণ্ডটা শুনে প্রথমটা চমকে গেলেন। তারপর একটু দুঃখিত হলেন, ক্রমে মনে বড় ভয় হল। ভয়টা ছেলেটার কি হবে তা ভেবে তত নয়, যত নিজের চাকরীটার অনিষ্ট আশঙ্কা করে। আশঙ্কাটা এই যে ছেলেটার এই কুকাণ্ডের কথা খবরের কাগজে বের হবে, আর আপিষ থেকে নোটিস আসবে যে তাঁর ছেলেকে যদি তিনি সামলাতে না পারেন ত তাঁর চাকরী থাকবে না। এই রকম ভয়ে ও ভাবনায় তিনকড়ি বাবু অতি ব্যস্ত হয়ে প্রবোধ বাবুর কাছে গিয়ে উপদেশ নিয়ে এলেন। প্রবোধ বাবু দয়া করে উপদেশের জন্য ফি টা আর নেন নি।

৪র্থ দৃশ্য—ধর্ম্মাধিকরণ।

ধর্ম্মাবতার নন্দলাল ঘোষ আসীন। বিচারের জন্য সুবোধ সুধীরকে যথারীতি উপস্থিত করে টাউন আউট পোষ্টের জমাদার সাক্ষ্য দিলেন—বালক আসামী দুটি ভয় দেখিয়ে বিলিতী কাপড় কিনতে বারণ করছিল, এবং ষাট সত্তর জন লোকের সঙ্গে মিলে বে-আইনি জনতা করে লোকের যাতায়াতের পথ বন্ধ করেছিল। সুধীর বলে উঠ্‌ল "মিথ্যে কথা, মোটে চোদ্দ পনর জন লোক

ছিল, তার মধ্যে ওঁরাই ছিলেন সাত আট জন। আর বাকী পাঁচ সাত জন তামাসা দেখতে এসেছিল।" সুধীর আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিল হাকিম রুষ্ট হয়ে বললেন "ইচ্ছে করলে জেরায় এ সকল কথা তুমি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করতে পার। এখন চুপ কর, আমি যখন জিজ্ঞাসা করবো তখন ব'লো।" সুধীর কার্য্যবিধি-আইন বা প্রমাণ-আইন জানে না, তাই ওই কথাগুলো ব'লে ফেলেছিল, হাকিমের রাগ দেখে চুপ ক'রে গেল, আর কিছু বললে না। হাকিম কোর্টসবইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন "যে লোকটাকে এরা বারণ ক'রেছিল সে এসেছে ত? আর মঙ্গলরাম মারওয়াড়ীও বোধ হয় এসেছে?" কোর্ট-সবইন্‌স্পেক্‌টার জানালেন যাকে এরা বারণ ক'রেছিল তাকে পাওয়াই যায় নি, আর মারওয়াড়াটাও ভয়ে সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছুক। টাউন-জমাদার বললেন "হুজুর এদের ভয়ে কেউ কিছুই বলতে চায় না।" কোর্ট-সব-ইন্‌স্পেক্‌টার একটা কনষ্টেবলের সাক্ষ্য দেওয়ালেন এবং বললেন আরও দুজন কনষ্টেবল-সাক্ষী উপস্থিত আছে। আবশ্যক হলে তিনি তাদের সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেন, কিন্তু তিনি মনে করেন যা হয়েছে তাই যথেষ্ট। হাকিম ও বোধ হয় যেন তাই মনে করলেন। বিচার অভিনয়ের বাকী অংশটা মামুলীধরণের। আসামীরা জেরাও করলে না, কোন কথাও বললে না, এবং শিখিয়ে দেওয়া সত্বেও ক্ষমা প্রার্থনা করলে না। তাদের অবশ্য সাজা হল, কি সাজা হল সে কথাটা এমন বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। সেটা না শুনলেও চলে।

৫ম দৃশ্য—প্রবোধবাবুর বৈঠকখানা।

সেদিন সহরে সর্ব্বত্রই এই কথার আলোচনা। সহরটি ছোট, কাজেই বিষয়টা গুরুতর হ'ক, আর লঘুতর হ'ক, তাতেই পূর্ণ হ'য়ে গেল। প্রবোধ বাবুর বৈঠকখানায় অনেকগুলি লোক বসেছিলেন। একজন বললেন "প্রবল-প্রতাপ ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে এই অপোগণ্ড শিশুরা বিদ্রোহ ক'রবে! এদের জেলে না দিয়ে পাগলাগারদে দেওয়াই উচিত।" আর একদল বললেন "শিশুছটি ত নিমিত্তমাত্র। যাঁরা এদের চালক তাদের শিক্ষার জন্তেই এদেকে দণ্ড দিতে হয়।" তৃতীয় ব্যক্তি ব'ললেন "নেতাদের সম্বন্ধে অন্য যা কিছু বলা যাক্, তাঁরা যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছুড়ছেন, সে কথা আর বলা যায় না, অন্ততঃ এই অসহযোগের ব্যাপারে। বড় বড় নেতারাই আগে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দণ্ড নিয়েছেন।" একজন বললেন "দুঃখের বিষয় এই সকল বিষয়ে

হাকিমদের বিচার-স্বাধীনতা বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। চারুবাবু বললেন Executive আর Judicial function দুটো দুঠাঁই হ'লে হাকিমদের স্বাধীনতা একটু বাড়তে পারে; আর তা হ'লে বোধ হয় বিচারটা একটু ভাল হ'তে পারে, আইনের মাহাত্ম্য বজায় রাখবার জন্যে বে-আইনী কিছু করতে হয় না।

প্রবোধ বাবু। কিন্তু autocratic Government নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ও দুটো কাযকে একাধারেই রাখতে চায়, পৃথক করলেই autocracy'র জায়গায় democracy এসে পড়ে অথবা democracy না হলে ও দুটো পৃথক করা যায় না। সেই জন্যে autocratic Government এর মাজিষ্ট্রেটদের আইনের স্বরূপ জানা তত আবশ্যক নয়, যত আবশ্যক তার মহিমা রক্ষার উপায় জানা। মাজিষ্ট্রেটদের অবশ্য শেখান হয় যে অপরাধীর সংস্কার আর অপরাধের নিবারণ করাই দণ্ড বিধানের মূল তত্ত্ব। কিন্তু এই দুটী বুঝে কাজ করতে হলেই হাকিমকে অপরাধীতে অপরাধীতে এবং অপরাধে অপরাধে বিশেষ করতে হয় এবং তার জন্যে অপরাধ তত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব শিখতে হয়। কিন্তু এ দুটী বিষয়ে সাধারণ হাকিমগণ যে বিশেষজ্ঞ এমন দুর্ণাম তাঁদের শত্রুরাও দিতে পারেন না। কাজেই দণ্ডের পাত্র এবং মাত্রা উপযুক্ত হয় না, বাঞ্ছিত ফল লাভও হয় না। এই উপযুক্ততার জ্ঞান প্রত্যেক হাকিমের নিজস্ব-একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। সেই জন্যে অর্থদণ্ডের মধ্যে একটাকা থেকে একহাজার টাকা, আর কারাদণ্ডের মধ্যে আদালত বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত বসে থাকা থেকে ছ' বছরের জেল, সব রকমই আছে। এই সে দিন দুজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী দুই সংবাদপত্র সম্পাদকের নামে মানহানির মোকদ্দমা করেছিলেন; এক সম্পাদকের দণ্ড হল ৫০০৲ জরিমানা, আর এক সম্পাদকের হল ১০০৲ টাকা জরিমানা। এথেকে যদি কিছু বোঝা যায় তা এই যে এই দুটি হাকিমের অপরাধমানযন্ত্র এক জাতীয় নয়। পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বশিক্ষালয়ে একবার এঁদেকে পাঠিয়ে দিয়ে এঁদের মনস্তত্ত্ব-রহস্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা উচিত। এই ত গেল দণ্ডের মাত্রার উপযুক্ততা। পাত্রের উপযুক্ততার জ্ঞান আরও চমৎকার! এই অসহযোগ-সম্বন্ধীয় অপরাধীরা কেউই আপনাকে অপরাধী বলে জানেন নি, বিশ্বাসও করেন নি। বরং তাঁরা জেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন যে তাঁরা নিরপরাধ। যেখানে তথাকথিত অপরাধীর মানসিক অবস্থা এইরূপ সেখানে তার ওপর দণ্ডের প্রভাব কিরূপ হবে? এইরূপ পাত্রে নানা মাত্রায় যে দণ্ডের প্রয়োগ

করা হচ্ছে, তাতে কি অপরাধীর সংস্কার হবে? অপরাধের নিবারণ হবে? যেরূপভাবে এই অপরাধীরা আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র না করে নির্ব্বিকার চিত্তে কারাবরণ করে নিচ্ছেন তা থেকে ত এইমাত্র অনুমান হয় যে দণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

মানুষের সভ্যতার আদিম কালে দণ্ডের মূলে ছিল প্রতিহিংসা, তখন দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ নেওয়া হত। একশ বছর আগে ইংলণ্ডে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হত তার একটা নমুনা দিই। Old Baileyর বিচারালয়ের কাগজ পত্রের মধ্যে এই বৃত্তান্তটি পাওয়া গিয়েছে এবং লণ্ডনের টাইমস্ পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে—

"ওল্ড বেলী, বৃহস্পতিবার, মে ৩০, ১৮২২। বালকের দুর্নীতি পরায়ণতা। জন ম্যালোনি নামক একটি ১৪ বছরের বালক টমাস মলি নামক একজনের পকেট থেকে একখানা রুমাল চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। চুরির বিচারে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আদালতের দণ্ড হল তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।"

এ রকম দণ্ড তখনকার সমাজ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করত। এখন একে বলে বিচারের নৃশংসতা—Judicial ferocity. কিন্তু এর মূলে আছে এইরূপ দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে সমাজকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এবং উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য যতই প্রশংসনীয় হ'ক, উপায়টা যে গর্হিত তাতে আর সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষের মত সমাজেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে বটে, এবং সে অধিকার পরিচালন করতে, আবশ্যক হ'লে হত্যাও অবৈধ নয়। কিন্তু তাতে কি ব্যক্তি বা সমাজ সংরক্ষিত হয়েছে? খুন, ডাকাতি, চুরি, দাঙ্গা হাঙ্গামা কি কমেছে? বছর বছর দেশের শাসন-বিবরণী এবং পুলিসের কার্য্য বিবরণী থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সামান্য কম বেশী হ'য়ে অপরাধের সংখ্যা প্রায় সমান সমানই থাকে। এই সামান্য কম বেশীর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ারও রীতি আছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ অপরাধীর সংস্কারক নয়, অপরাধেরও নিবারক নয়। আর যাঁরা আইনের পরিচালনদ্বারা শাসনকার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁদের সময়ও নেই এবং প্রবৃত্তিও নেই যে অন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সময় এবং প্রবৃত্তি না থাকলেও দেশে হৃদয়বান্ চিন্তাশীল মনস্বীর অভাব নেই। তাঁরা মনস্তত্ত্বের মত অপরাধতত্ত্বকেও বিজ্ঞানের আসন দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন আগে ধর্ম্ম (religion) দুর্নীতি-পরায়ণতার নিবারণের চেষ্টা করে

কৃতকার্য্য হ'তে পারে নি; এখন বিজ্ঞান তার হেতুর আবিষ্কার করে, ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে তার যথোচিত প্রতিকার করবে! কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক, শাসক এবং বিচারক, কারোরই সে কথা ভাববার মত মনের অবস্থা হয় নি। কাযেই তাঁরা অপরাধীর নৈতিক এবং মানসিক অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে তার সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দণ্ড বিধান করে যাচ্ছেন। ফলে দণ্ড-বিধানের যা উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। দেশের হাজার হাজার বালক, যুবক, প্রৌঢ় যে দণ্ডের ভয়ে ভীত না হয়ে নিরপরাধের শান্ত সমাহিত চিত্ত নিয়ে পুনঃ পুনঃ কারাবরণ করে নিচ্ছেন। শাসকবর্গ এখন অপরাধতন্ত্রের আলোতে তার নতুন করে অনুসন্ধান করুন; নতুন দণ্ডের বিধান করুন যাতে দণ্ডিতের মনে অনুতাপ হয়; তবে ত অপরাধীর সংস্কার এবং অপরাধের নিবারণ হবে, রাজবিধি মহিমান্বিত হবে এবং তার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রচলিত বিধিব্যবস্থার কথার রদ বদল করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বিধি ব্যবস্থার কথার মধ্যে আত্মার আবির্ভাব চাই।

চারুবাবু বললেন "ও তর্কে ধরে নেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যা করেছে সেটা অপরাধ বটে। কিন্তু সেইটাই ইংরেজী লজিকের ভাষায় begging the question. যে কাযটা অভিযোগের বিষয় সেটা প্রকৃত অপরাধ কি না প্রথমে তারই বিচার করা কর্ত্তব্য, তারপরে দণ্ডের কথা। কিন্তু সেইটাই হয় না, অভিযুক্তকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, যে তার কাযট অপরাধ। অভিযুক্ত মনে করে সে যা করেছে তা অপরাধ ত নয়ই, বরং তা দেশের পক্ষে হিতকর, না করলে প্রত্যবায় আছে। কাযেই এইরকম লোকের যখন দণ্ড হয় তখন সে এবং তার মত অসংখ্য লোক মনে করে নিরপরাধের দণ্ড হল। কাযেই সে দণ্ড দণ্ডিতকে লাঞ্ছিত না করে, গৌরবান্বিত করে আর বিচার প্রণালী লোক চক্ষুতে নিন্দিত হয়।"

আইন কানুনের ধার ধারে না এমন একটি লোক বলে উঠল "আজ্ঞে' রাজদণ্ডই সে কাযটি করে দেয়। যাদের মস্তিষ্কের আবরণটা একটু স্থূল, কাণ্ড জ্ঞান তা ভেদ করে সহজে প্রবেশ করতে পারে না, রাজদণ্ড তাদেরই হিতের জন্য প্রযুক্ত হয়, আর প্রয়োগ মাত্রেই ফললাভ হয়, মস্তিষ্কের আবরণটাকে সচ্ছিদ্র করে কাণ্ড জ্ঞান অবাধে প্রবেশ লাভ করে—অন্ততঃ প্রয়োগ কর্ত্তারা এইরূপ মনে করে।"

ওরে তোর গানের আসর তোল্!
কাণে মোর পশবে না সে গোল্
কাণে মোর পশবে না সে গোল্!
হয়ত তবু অকারণেই
জয়ের দোলন আস্‌বে বুকে থেমে,
গলার স্বরে লাগবে কাঁপন লাগবে রে মোর
এ দুই আঁখে খেল্‌বে তড়িৎ আস্‌বে বাদল নেমে!
হায় রে যারা বাজিয়ে যাবে সঙ্গে :আমার
পার্ব্বে না আর
কাট্‌বে কেবল সুরের তালমান!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
সবাই এসে বল্‌বে এটা পাগল এলো কোন্!
অসম্ভবের খেয়াল কেন জুড়লে রে ওর মন
ওরে আজ জুড়লে পাগল মন!
তবু হায় রইব অচেতন
আমি তায় রইব অচেতন!
সবাই তখন উঠবে ক্ষেপে
থামিয়ে দিতে চাইবে আমার গীতে,
সকল পীড়ন ঢাল্‌বে রে মোর ঢাল্‌বে শিরে
কর্ব্বে আঘাত বেদন হানি হাতের বীণাটিতে
থাম্‌বে না গান,—হিংসা মাখা জোর অসহন
কাঁদ্‌বে তাদের
কর্ব্বেরে মোর হাজার অপমান!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
শিরায় শেষে বন্ধ হবে রক্ত চলাচল!
কণ্ঠ দিয়ে ঝর্‌বে ঝলক ঝর্‌বে গলগল্
সে শোণিত ঝর্‌বে গলগল্!
তবু মোর কম্‌বে নাকো বল্

তবু মোর কম্‌বে নাকো বল্‌!
হয়ত হৃদের তন্ত্রীগুলো
প্রবল টানে হঠাৎ যাবে ছিঁড়ে,
এই দেহটায় আস্‌বে অবশ আস্‌বে রে মোর
কল্‌জে যাবে চিঁরে এবুক ভাস্‌বে নয়ন-নীরে!
হায়রে তখন স্তব্ধ বিরাট্ শূন্ত মাঝে
ধীরে ধীরে
বেরিয়ে যাবে এই অভাগার প্রাণ!
তবু আজ গাইব রে সেই গান
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!
থাম্‌বে রে গান! ঝঙ্কার তার তুল্‌বে হাহাকার!
বিশ্বজুড়ে উন্মাদনায় ঘুর্‌বে সকল ধার
অচলে খুঁড়বে পারাবার!
অসীমের শক্তি প্রাণে তার!
অসীমের শক্তি প্রাণে তার!
তখন তোদের ভাঙবে রে ঘুম
তখন তোরা দেখবি নয়ন চেয়ে,
হাহা স্বরে কাঁদ্‌বি তখন কাঁদ্‌বি রে ভাই
কাহার তরে ফিরবি বেগে ছুটবি তরী বেয়ে!
হায়রে আমি উঠব তখন অট্টহেসে
বল্‌ব এ যে
মরণ-মাখা ব্যর্থ তারি দান!
ওরে ভাই গাইব আমি গান,
আমি আজ গাইব রে সেই ঘুম-ভাঙ্গানো গান!

—০—

ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

উপন্যাস পড়িতে গিয়া যে প্রশ্নটি বহুবার উঠিয়াছে ও যাহা লইয়া আজিও বাক্ বিতণ্ডার শেষ হইল না তাহারই একটু আলোচনা করিবার জন্য এই অবতারণা। ঔপন্যাসিককে নিজের কথায় লক্ষ্য প্রচার করিতে কচিৎ দেখা যায়, আর যদিও বা করিয়া থাকেন সেই সব উক্তির মধ্যেও যথেষ্ট মতের অমিল দেখা যায়। সেই জন্যই ঔপন্যাসিকের কি যে বাস্তবিক উদ্দেশ্য তাহা বোঝা হয় না, আরও দশজন আসিয়া সেই বোঝাটাকে আরও ঘোলাটে করিয়া তোলেন মাত্র।

এই অবস্থায় ঔপন্যাসিক টীকাটিপ্পনীতে একটা বেশ উত্তর দিয়া পাঠক-বর্গকে তৃপ্ত না হোক নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন চিত্র রচনা করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং যদি আমার বিচার করিতে হয় চিত্রের সুসঙ্গতি, স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি দেখিয়া সেই বিচার কর, "এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুবিধা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়"। ঔপন্যাসিকের যাহা উদ্দেশ্য তাহার রচনার শিল্পত্বেই পর্য্যবসিত, অন্য কোনও বাহ্য উদ্দেশ্যের সার্থকতা তাহার চক্ষে মূল্যহীন।

এক কথায় আসল কথাটাকে বিপর্য্যস্ত করিতে হইলে এইরূপ উত্তর বেশ ভালই মানায় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্নের তাহাতে কোন কিনারা হয় না। ফলকে জন্ম দেওয়াই গাছের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলেই যদি ফলের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বলা হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। কিন্তু এ কথা জানা আছে ভোক্তার সহিত ফলের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটি যদি না থাকিত, তাহা হইলে ফলের অনেকখানি অস্তিত্বই ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই জন্যই ফলটিকে সৃষ্টি করার মধ্যেই গাছের পরিপূর্ণ সার্থকতা হইয়া যাইতেছে বলিলে অনেকখানি কথাই বাকী থাকিয়া যায়। এইজন্যই আংশিক ভাবে উপন্যাসের উপরোক্ত উদ্দেশ্য কতকটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, কথাটা শেষ হইয়া গেল বলিয়া চোক বুজিয়া আরাম উপভোগ করিবার ও উপায় নাই। স্বীকার করি ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য, জীবনের কোনও বিশেষ অবস্থার আনুকূল্যেও বিশেষ ঘটনার

সজ্জাতে মানবপ্রাণকে উজ্জ্বল করিয়া দেখান, মানবচরিত্রের একটা বিশেষ বিকাশ ও পরিণতি প্রস্ফুট করিয়া তোলা, কিন্তু ইহা ত উপায় মাত্র। এই চিত্র রচনার সার্থকতা কোথায়। এ প্রশ্নের উত্তর ঔপন্যাসিক না দিতে পারেন, তথাপি ইহার উত্তর যে পাইতে হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একজন শিল্পী ডাকিয়া বলিলেন, এই সহস্রধাস্ফুরিত বিচিত্র মানবজীবনের প্রকাশটি আমার নিকট একটি অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বস্তু। আমি দেখিতেছি জীবন একটা পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি ইহা কখনও সামঞ্জস্যে সম্পূর্ণ হইয়া একটি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কখনও শতধা বিখণ্ডিত হইয়া প্রলয়ের উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, ভালো মন্দের রেশমীসুতার সংমিশ্রণে একটি অপরূপ চিত্র প্রকট হইতেছে, ইহার এক অধ্যায়ে দেখিতেছি ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা, অপর অধ্যায়ে তেমনই স্পষ্ট দেখিতেছি পাপের প্রবলতা ও বিজয়-আস্ফালন। স্রষ্টার দৃষ্টিতে এই ভাঙ্গাগড়া উভয়ই আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে ভাল বলিয়া কোথাও স্রষ্টার তুলিকায় উজ্জ্বলতর বর্ণপাত যেমন দেখিনা মন্দ বলিয়া তাহাতে আবার তেমনি বর্ণপাতের কার্পণ্যও দেখিতে পাইনা। এইজন্য স্রষ্টারই মত ভালমন্দ নিরপেক্ষ হইয়া সুখদুঃখকে দুপাশে সরাইয়া দিয়া কেবলমাত্র সৃষ্টিরই পরম আনন্দকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়া আমি এই মানব জীবনের যথাযথ চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করাকেই উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি এবং পাঠকও যাহাতে এমনি নিরপেক্ষ হইয়া এই বিস্ময়কর সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন আমি তাহার চেষ্টা করি।

উত্তর দিতে না দিতেই কিন্তু সমাজধর্ম্মী নৈতিক মানবটির নাসিকা অনেকটাই কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"মানুষ যে কেবল দ্রষ্টাও নয়, স্রষ্টাও নয় এই কথাটা কেন আমরা যে ভুলিয়া যাই তা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মানুষ যে কেবলমাত্র দেখিবার অনন্ত স্বাধীনতা লইয়া আসে নাই তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হইবে। মানুষ যে পথিক মাত্র তাহার পথ চলা যে কত বাধা-বিঘ্নে কণ্টকিত, এই পথ চলিতে গেলে যে তাহার কতখানি সংযম শিক্ষার প্রয়োজন তাহাও কি সন্দেহের বিষয়। যাহা কিছু ভাল লাগে তাহার চর্চ্চা করিতে গেলেই যে তাহার সমূহ বিপদ এ কথা আমাদের ভুলিলে ত চলিবে না। এইজন্যই যাহা কিছু সৃষ্টি করিবার দেখাইবার ও দেখিবার অধিকার কাহারও নাই। মানুষ যেরূপ দেখে সেরূপ ভাবিতে বাধ্য হয় এবং সেইভাবে ভাবিত

হইলে সেইরূপ ভাবানুযায়ী কর্ম্ম ও করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার স্বাধীনতা বিধাতা তাহাকে দেন নাই ইহা যখন সত্য তখন যাহা ইচ্ছা ভাবিবার ও দেখিবার ও স্বাধীনতা দেন নাই ইহাও সত্য স্বীকার করিতে হইবে। অতি সতর্ক পদ ফেলে একখণ্ড দড়ির উপর ভর দিয়া তাহাকে খর স্রোতা পার হইয়া কৈলাসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ অবস্থায় যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার প্রেরণা আসিলে ও করিলে ত তাহার সর্ব্বনাশ। এই ভাল লাগা যে মানবকে কত বড় গভীর বিপন্নতার মধ্যে লইয়া যায় তাহা ত কাহারও অবিদিত নাই। এই জন্যই বলিতেছি যে মানুষকে নৈতিক হইতে হইবে, যাহা সৎ, যাহা মঙ্গল, তাহার সাধনা তাহাকে নিবিষ্ট মনে করিতে হইবে। সাধনার যাহা অনুকূল, জীবনের পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহাই যে বরণীয় আর তা-ছাড়া সবই যে বিষবৎ পরিত্যজ্য, শত মোহনতা মধুরতা আসিলেও যে তাহা তাহার প্রাণনাশক তাহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে! এই জন্যই আপনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যাহা সৎ যাহা নৈতিক আদর্শের অনুযায়ী তাহাকে মোহন মধুর করিয়া দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করা। তাহা না করিয়া শুধু ভাল লাগার নাম করিয়া পতঙ্গের সম্মুখে দীপশিখাকে সুন্দর করিয়া স্বাভাবিক করিয়া আঁকিয়া তোলা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

"জানি অনেকে বলিয়া থাকেন পাপের চিত্র আঁকিয়া তাহার বিষময় পরিণাম দেখাইয়া চিত্তকে উন্নত করা যায়। যদিও ইহাতে শিল্পীর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় তথাপি ইহাকেও আমি পাপ প্রশ্রয়েরই ছলনা মাত্র না বলিয়া পারি না। কারণ পাপের পরিণাম দেখাইতে গিয়া ইঁহারা প্রথম পাপের মোহনতা দেখাইতে বাধ্য হন। পাঠকের চিত্ত ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারে না। আর একবার যখন চিত্ত পাপের দৃশ্যে ও ভাবে মুগ্ধই হইল তখন পরিণাম দর্শনের কোনও প্রভাব কি হইতে পারে! ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ইহার একটি নিদর্শন। মোট কথা গল্প গল্পই থাকিয়া যায়, অথচ পাপের চিত্র মানব চিত্তকে তদ্বিষয়ে ভাবিবার একটা প্রকাণ্ড অবসর মাত্র আনিয়া দেয়।

"তার চেয়ে আমার মতে ঔপন্যাসিকের উচিত শুধুই আদর্শ চিত্র আদর্শ জীবন আদর্শ কর্ম্মকে অঙ্কিত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধানত করিয়া তোলা। অনেকে বলিতে পারেন আদর্শচিত্র আঁকিতে হইলেও ত contract বা বৈপরীত্যের প্রয়োজন। ব্ল্যাক বোর্ড যদি কাল না হয়, খড়ির আঁকা ছবি যে শুভ্র এ কথাটা বোঝা দূরের কথা, ছবি আঁকাই সম্ভব হইত

না। কোন চিত্রকে ফুটাইতে হইলে তাহার পাশে একটি বিপরীত চিত্রও দাঁড় করাইতে হয়, এইজন্যই রোহিণীর পাশে ভ্রমর, ওথেলোর পাশে আয়াগো, বিলাসের পাশে নরেন। কিন্তু আমি বলি এইরূপ বিপরীত চিত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। আমাদের স্ব স্ব মানসিক অবস্থাই আদর্শ চিত্রের contrast এর স্থান পরিপূর্ণ করিবে। আদর্শ চিত্রের মহত্ত্ব অনুভব করাইবার জন্য ভ্রমরের পাশে রোহিণী না থাকিলেও চলিত; নরেনের হৃদয়ের সরল মহত্ত্ব বিলাস না থাকিলেও স্পষ্টই বোঝা যায়। আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাপচিত্রের প্রয়োজন নাই।"

যাঁহাকে এতক্ষণ নৈতিক মানব এই সব কথা শুনাইতেছিলেন তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "দেখুন যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যে আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্ত, চক্রান্ত করিয়া পাকে চক্রে মারিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন একথা আর যেই মানুক আপনি নিশ্চয়ই মানেন না। অথচ দেখুন তিনি ত আমাদের চক্ষুকে শুধু প্রলোভনপ্রিয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সম্মুখে আবার যথেষ্ট প্রলোভন ও ধরিয়া রাখিয়াছেন দেখিতে পাই। ইহাতে ত এমন মনে হয় না যে বিধাতার ইচ্ছা এই যে মানুষ তাহার চোখে সাতপাক কাপড় জড়াইয়া কোন রকমে এক দৌড়ে এই সংসারটা পার হইয়া যাক্। তার চেয়ে আমরা যাহাতে দেখি, সেই জন্যই ত তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাই। যদি এক দৌড়ে মাঠ পার হওয়াই সংসারের পরীক্ষা পাশের উপায় হয়, তাহা হইলে বিশ্বস্রষ্টাকে মানবের শত্রু না বলিয়া পারা যায় না, নতুবা বলিতে হয় বিশ্বস্রষ্টা একটি পরম বোকা। আমার কিন্তু মনে হয় তিনি বোকাও নন শত্রুও নন। মানুষকে প্রলোভনের মাঝ দিয়া বহু দুঃখদহন সহ্য করিয়া বহু আঘাতে নিদারুণ শিক্ষা লইয়া তবে এই সংসারের পথ চলিতে হয়। যদি সংসারের কোনও সুসঙ্গত শান্তিময় পরিপূর্ণতার লক্ষ্য থাকে তবে তাহাকে এই সংসারের করুণ শিক্ষালয়ে পূর্ণশিক্ষা লইয়াই সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে; সে শিক্ষা সাতপাক কাপড়ের অন্ধ সংযমে হইবার নয়। এই সাধনার পথে চলিবার অধিকার প্রতিপদে অতি নিদারুণ বেদনা বিনিময়ে অর্জ্জন করিতে হয়। এজন্ত আমি চাই এই চিত্তজগৎকে অতি উজ্জ্বল করিয়া তাহার ভালমন্দকে এতটুকুও বাদ না দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে। আমি জানি এ জগতে ভাল ও মন্দের সমান দর; স্রষ্টা উভয়কেই একটি কোনও শাশ্বত প্রয়োজনের খাতিরে সৃষ্ট করিয়াছেন। বেদনা এখানে আনন্দের

মূল্য, পাপ এখানে পুণ্যের পথ, অকল্যাণ কল্যাণের আয়োজন। সেই জন্য আমি চরিত্র সৃজন করিতে কাল্পনিক 'কেবল ভাল' আঁকিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিতে ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে পারি না। আমি যাহা সৃষ্টি করি তাহার মাঝ দিয়া জগৎকে আমি সত্য করিয়া দেখাই। বলিতে পারেন তাহা হইলে আর তোমার সৃষ্টির কি প্রয়োজন, জগৎ প্রকৃতি দেখিলেই ত হয়। না, তাহা হয় না। বহুকাল হইল একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছিলেন "কাব্যজগৎ এই জড়জীবজগতের সার—এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক। কাব্য-শোধিত সংসার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। কাব্যে যে তীব্রতা আছে, যে উপকারিতা আছে সংসারে তাহা নাই। কেননা সংসার যদি গোলাপ ঝারি হয় তবে আমরা বলিব কাব্য আতর। আবার সংসার যদি দ্রাবক হয়, কাব্য মহাদ্রাবক। * সংসারে ও উপন্যাসে চিত্রিত সংসারে অনেক ভেদ আছে। সংসারে জীবনের বিকাশ ব্যাপার এত জটিল, এত গোপন ধীর গতিতে চলিতে থাকে যে প্রায়শঃই তাহার পারম্পর্য্য ও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা ধরা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; সুতরাং দেখার কোনই সার্থকতা থাকে না। মানব এই সংসারে নিজেও কর্ম্মী, নিজেও নানা ভাবের তরঙ্গে তাড়িত, এখানে তাহার দেখার অখণ্ড অবসর নাই, দেখিতে গিয়া এখানে সে নিজেও কর্ম্ম জড়িত হইয়া পড়ে। দেখিতে হইলে বস্তুটি যেমন অত্যন্ত জটিলতাময় না হইলেই তাহার ধারনা সহজ হয়, তেমনি আবার দ্রষ্টাকেও কতকটা ব্যবধানে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। বস্তু যদি চোখের সহিত লাগিয়া থাকিত তাহা হইলে কিছুই দেখা সম্ভব হইত না। বস্তু ও চোখের মধ্যকার ব্যবধানটাও দেখার একটা প্রধান সহায়ক। উপন্যাসজগৎ এই ব্যবধানটি সৃষ্টি করিয়া এই দেখাটিকে সহজ সুগম করিয়া তোলে। আরও একটি কথা আছে।

জীবনের এই বাস্তবচিত্র স্বভাবতঃই করুণ রসাত্মক হইয়া থাকে। এই জন্যও অনেকে বিয়োগান্তক সৃষ্টিকে আমল দিতে চাহেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তাহা হইলে কি যাহা সত্য তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে কাল্পনিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখাই শিল্পীর সাধনা হইবে? অতীন্দ্রিয় জগতের কথা জানিনা সেই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু বাস্তব জগতের যাহা সত্য তাহার দিকে চাহিয়া বাস্তব জীবনের ঘটনাপুঞ্জের দিকে চাহিয়া

* বান্ধব শ্রা-ভা. ১২৮৩ নাটক প্রবন্ধ।

আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিবার মত মনোভাব যে হয় না তাহা সত্য। পাপপুণ্যের কথা ছাড়িয়া দিলাম, তাহার সহিত সুখদুঃখের কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ এই দুটা চোকে ত দেখা যায় না। তাই আমি দেখিলাম এই জীবন বড় করুণ, মানবভাগ্য বেদনাময় অশ্রুময়,—বিশ্বশক্তিপুঞ্জের অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। এই সত্যের দিকে চাহিয়া অতি বড় পাপীকে ও আর ঘৃণাভরে ঠেলিয়া দিতে পারা-যায় না, কিরণ্ময়ী পাপিষ্ঠা কিন্তু করুণাবিগলিত মমতা অনুভব না করিয়া, অসহায় শিশুকে যেমন করিয়া মা বুকে টানিয়া লন তেমনি তাহাকেও বুকে তুলিয়া না লইয়া ঘৃণা করিবার মত অমানুষিক হৃদয়হীনতা কাহার আছে আমি জানি না। বিশ্বের মাঝে নিয়তির এই রহস্যময় লীলা দেখিয়া কি আর মানবকে তাহার কোন বিশেষ কর্ম্মের জন্য দায়ী করিয়া তাহাকে অপরাধী করিতে মন সরে? মানবের পরম অসহায়তার দিকে যাহার চক্ষু পড়িয়াছে সে কি আর ভালকে ভাল বলিয়া হাসিতে পারে না, মন্দকে মন্দবলিয়া ঘৃণার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিতে পারে? অসহায় মানবের দিকে চাহিয়া এই যে করুণায় হৃদয় গলিয়া যায়, ইহা কি কোন ও অংশে নৈতিক শিক্ষা অপেক্ষা হীন এবং ইহাই কি জীবনের চরম শিক্ষা নয়! পাপীকে সরাইয়া রাখিয়া যে বিশ্বকে দেখিতে চায় দেখুক আমি কিন্তু মানবকে পাপপুণ্যের সংঘাতের মধ্যেই দেখিতে চাই; এই বাস্তব সৃষ্টিই আমার লক্ষ্য।"

ভাববাদী ঔপন্যাসিক ইতি মধ্যে পাশে আসিয়া বসিয়া ছিলেন তিনি বলিয়া উঠিবেন "কিন্তু আপনি একটি কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝখানে এই আমার আমিটিও রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্র্য, দেখিয়াছেন আমি ও যে স্রষ্টার আর একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব হইতে ভিন্ন রকমের বিচিত্র সৃষ্টি তাহাআপনি অস্বীকার করিতেছেন। স্রষ্টা এই জগৎটিকে সম্পূর্ণ যাহা হওয়া উচিত তাহা করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই, অনন্ত কালের পথ বাহিয়া এই জগৎ চলিয়াছে। আজি ও এ জগৎ পরিপূর্ণতা ধরিতে পারে না হয় ত আর পারিবেও না। এ জগৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনার অপরিপূর্ণতাকে প্রচারিত করিতেছে ও পরিপূর্ণতার অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে মাত্র। ইহা হইতেই আপনি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন মানব জীবন ও এমনি অপরিপূর্ণ। কিন্তু আপনি বিশ্বসৃষ্টিতে ও আমাতে যে স্রষ্টার ইচ্ছাবৈচিত্র্য আছে তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এ জগতের আর সমস্ত বস্তুতে আমাতে এইটুকু বিশেষ ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে যে অন্য সমস্ত বস্তু তাহার সৃষ্টি কৌশলের একটা প্রকাশ মাত্র কিন্তু

আমাতে স্রষ্টার সৃষ্টিপ্রবণতাটুকু ও আসিয়া পড়িয়াছে। আমার মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি ও রহিয়াছে। সমস্ত অসম্পূর্ণতার মধ্যে থাকিয়াও আমার মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার শক্তি সম্ভাব্যতা রহিয়াছে। তাই এ জগৎ যে পরিপূর্ণতার দিকে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে আমার বিচিত্র মন আপনার ধ্যানালোকে কল্পলোকে সেই পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই জন্যই বাস্তব সৃষ্টির নাম দিয়া মান অন্তরের বিরাট সম্ভাব্যতাকে আপনি যখন অস্বীকার করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ও অসহায় করিয়া দেখাইয়া বসেন তখন আমি কিছুতেই তাহাকে সত্যকার বাস্তব সৃষ্টি বলিতে পারি না।

'অপরিপূর্ণতার বন্ধনে এই যে সৃষ্টি কাঁদিয়া ফিরিতেছে তাহার এই বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি নাই, শুধু আমার আমিটি এই প্রয়োজনের চক্রপেষণ হইতে, সীমার বদ্ধতা হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া পরিপূর্ণ আনন্দলোকে উপনীত হইতে পারে। যদিও মানব বন্ধনের বেদনায় কাতর, তথাপি তাহার মধ্যে মুক্তির একটা দিক রহিয়াছে। শত বন্ধনের দংশনপীড়িত এই মানব জীবনের ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া জানি না অনন্ত আকাশের কোন নক্ষত্রলোকের বার্ত্তা লইয়া কোন পরিচয়ের স্মৃতি বহন করিয়া উদাস দক্ষিণা হাওয়া কখনও কখনও আসিয়া মানব চিত্তে কি আলোড়ন তুলিয়া দেয় অমনি মুহূর্ত্তে যত বন্ধন যত দীনতা যত বদ্ধতা সব কোথায় ঝরা পাতার মত উড়িয়া যায়; মানব আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করে. তখন যেন আমার মধ্যে এ কোন্ আমির লীলা অনুভব করি আমি যেন স্রষ্টার সহিত এক হইয়া যাই কোথায় যেন ভেদ থাকে না। সেই মুক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আর কিছুতেই এই তথাকথিত বাস্তব সৃষ্টকে সত্য সৃষ্টি বলিয়া সমাদর করিতে পারি না।"

বাস্তববাদী বলিলেন "আপনি যে কোন্ নক্ষত্রলোকের বার্ত্তার কথা বলিতেছেন উহা বাস্তব জীবনের সত্য নয় উহাকে আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা অনুভব করি।"

ভাববাদী উত্তর করিলেন "আপনার একথার উত্তর ও পূর্ব্বেই দিয়াছি। আপনি শুধু বিশ্বকেই দেখিতেছেন। আমার মন বলিয়া বস্তুটি তাহাকে আপনি ভাল করিয়া দেখিতেছেন না। আমার মন যখন আপনার বাস্তব সত্যকে ছাড়াইয়াও অন্য সত্যের সন্ধান পায় তখন আমিও যেমন ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, আপনিও তেমনি ইহাকে সত্যের মর্য্যাদা না

দিয়া পারেন না। এই মাত্র বলিতে পারেন যে আমার কল্পনা আপনার সীমাবদ্ধ বাস্তবতাকে পার হইয়া গিয়াছে। ইহাকে অসত্য বলিবার আপনার কোন যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই।”

নৈতিক মহাশয় একটু আশ্বস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ভাববাদী মহাশয় নীতিশাস্ত্রের কথাটাও পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। একটু অধীর হইয়া বলিলেন “তাহা হইলে আপনিও কি বলিতে চান যে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকার কোনও প্রয়োজন নাই?”

উত্তর হইল “দেখুন আমি ত তাহা বলি নাই তবে একথা বলিব যে নৈতিক জগৎটাও বন্ধনের জগৎ, পথ চলাটাও নিয়মের বন্ধন। তবে এই পথ চলা প্রয়োজন হইতে পারে, হইতে পারে যে প্রয়োজন আছে। কারণ নৈতিক সাধনার ও লক্ষ্য হইয়া পরিপূর্ণতার দিকে স্বাধীনতার দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে নৈতিক সাধনার মধ্যেও প্রকৃত আনন্দ নাই। মানবের অন্তঃপ্রকৃতি এই নৈতিক সাধনার বাঁধা বাঁধির মধ্যে স্বাধীনতা পায় না, আনন্দ পায় না। এই জগৎকে পরিপূর্ণ করিয়া দেখার ও জানার যে আনন্দ আছে নৈতিক সাধনা তাহা দিতে পারে না। অথচ মানুষের মধ্যে যে একটা মুক্তির প্রেরণা রহিয়াছে তাহা ক্রমাগতই তাহাকে সকল আবরণ মুক্ত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে, সকল বন্ধন সকল সীমাকে উপেক্ষা করিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে। অথচ মানবের স্বাভাবিক সংস্কারগত যে বদ্ধতা তাহা তাহাকে কিছুতেই ওই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে দেয় না। বদ্ধতা আছে বলিয়াই সে নিয়মকে অতিক্রম করিতে গেলে নানা অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের এই দুই মুখী গতি—এক বদ্ধতার দিকে, অপর মুক্তির দিকে—তাহাকে টানাটানি করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, মানবের মধ্যে এই মুক্ত আমি ও বদ্ধ আমির বিরোধ রহিয়াছে বলিয়াই আমার সহিত আপনার মিল কিছুতেই আর হইয়া উঠিতেছে না।

“মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? যতক্ষণ আপনার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব এই মুক্ত আমি ও বদ্ধ আমির বিরোধ না মিটিতেছে ততক্ষণ কিছুতেই একটা স্থির মীমাংসা হওয়া সম্ভাবনা নাই। শুধু ঔপন্যাসিকের সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া ও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

“মানবাত্মা যখন অকস্মাৎ আপনার মধ্যে আপনাকে মুক্ত বলিয়া দেখিতে

পায় তখন সে দ্রষ্টার মত বলে আমি এই বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির কণামাত্র ও আমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে দিতে পারি না। বিস্মিত কৌতূহল ভরে আমি শুধু দেখিব—আমার, নিকট ভাল নাই মন্দ নাই—আমি জানি একমাত্র আশ্চর্য্যকে, বিস্ময়ময় রহস্যময়কে। তাহার দিকে চহিয়া দেখিতে আমার কণামাত্র সঙ্কোচ নাই, ইহাতেই আমার পরম আনন্দ।

"কিন্তু এই পরিপূর্ণ আনন্দ বোধ জীবনে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে চায় না। মুক্তির দিকটি বন্ধ হইয়া যায়। বাসনাচঞ্চল বদ্ধ আমির চাঞ্চল্যে এই পরিপূর্ণ আনন্দ উথিত হইয়া পড়ে; পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার অনাবিল সৌন্দর্য্য মেঘান্ধকারে মলিন হইয়া যায়, বেদনায় চিত্ত পীড়িত হয়; আবার ভাল মন্দের আবর্ত্তে পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। বদ্ধ আমিটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার যতই পক্ষপাতী হোক না কেন, তাহার পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা যে সুখময় নয়, চরণ যে তাহার শৃঙ্খলিত, চলার পথ যে তাহার সীমাবদ্ধ ইহা অতি কঠোর সত্য। মুক্ত আমির অধিকারের দিকে লুব্ধ হস্ত বাড়াইতে গিয়া বদ্ধ আমিকে বার বার মর্ম্মান্তিক জ্বালা লইয়া ফিরিতে হয়।

"এই জন্যই আমাদের বদ্ধ স্বভাবটি মুক্ত আমির প্রলোভনে পীড়িত হইয়া বলে ওগো আমায় আর তুমি এ প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলিও না। মানবের মধ্যে মুক্তি ও বন্ধনের এই বিবাদের অবসান না হইলে, তাহার এ দ্বন্দ্ব এ অশান্তি কিছুতেই মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। নীতিবিদ্ বদ্ধ আমিকে শাসন করিতে থাকবেন, ঔপন্যাসিক শিল্পী মুক্ত আমিকে লইয়া বিহার করিবেন, আর মাঝে হইতে আমার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চিরকালই চলিতে থাকিবে। এই দুটি আমিকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিবার কোনও উপায় যদি থাকে তাহার সন্ধান করুন নতুবা ভুল করিয়া আপনি আমার সম্পত্তি লইয়া টানিবেন আর আমি আপনার ধন লইয়া হয়ত টানাটানি করিতে থাকিবে। কারণ বাস্তবিক পক্ষে আপনার যাহাকে লইয়া কারবার আমার কারবার তাহাকে লইয়া নয়"।

পতিতার সিদ্ধি ।

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(৪৭)

সকলের জন্ত খাবার প্রস্তুত করা নির্ম্মলার শেষ হয় হয় হইয়াছে। শুভা, পুঁটি, মা—নির্ম্মলার উদ্দেশে সকল প্রকারের সম্বোধন করিয়া ব্রজেন্দ্রও ডাক হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সমস্ত বাড়ীটা এখন একরূপ নিস্তব্ধ কেবল মাঝে মাঝে নালুবাবুর পড়ার গুণ্ গুণ্ শব্দ নির্ম্মলার কানে পশিতেছিল। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল আর ভাবিতেছিল কি মূর্ত্তি লইয়া সে আজ স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। সাধ্বীর মর্য্যাদায় আজ আঘাত লাগিয়াছে। সে সব সহ্য করিতে পারে, শ্বশুর গৃহে শত প্রকারের লাঞ্ছনা—কিন্তু ওই আঘাতের এতটুকুও তার অসহ্য। মনের মলিনতা লক্ষ্য করিয়া এক মুহূর্ত্তেই তার সৎশ্বাশুড়ার উপর তার অশ্রদ্ধা হইয়াছে। এখন আবার স্বামা। তাহাকে নির্ম্মলা কি পণ্ডিত বলিবে? সে যে তার ছেলের কাছেই তাকে অপদস্থ করিল। ক্ষুদ্র বালক কি বুঝিয়াছে, না বুঝিলে ও স্বামীর উপরে নির্ম্মলার 'অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হইল। বুঝিল চরিত্রের কলুষতা যদি একবার কাহারও হৃদয়ের কোন অংশ অন্ধকারে ঢাকিয়া দেয়, শিক্ষার দীপ্তালোক সে স্থানটাকে আর দ্রষ্টব্য করিতে পারে না।

কিন্তু কি মূর্ত্তি লইয়া নির্ম্মলা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? অভিমান-রঞ্জিত মুখ লইয়া? কোথায় পাইবে সে অভিমান? প্রাণের যে অংশ লইয়া সে অভিমান দেখাইবে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে সে অংশ বিলীন প্রায় হইয়াছে। চিরশান্ত, সদানন্দময়ী—উগ্রমূর্ত্তিও ত কখন সে দেখাইতে পারে নাই। নির্ম্মলা রাঁধিতেছিল, আর ভাবিতেছিল। যে মূর্ত্তিতে সে শ্বাশুড়ী ও সরির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই জানিয়াও কিছু-না-জানা ভাবময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মলা কি ধরিতে ভুলিয়া গিয়াছে? সে মূর্ত্তি একবার দেখিয়া যে যার নিজের কাছে অপরাধী শ্বাশুড়ী কিম্বা সরি কেহই যে আর তাহার কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না!

রন্ধন কার্য্য তার শেষ হয় হয় হইয়াছে, নালু দ্বারদেশে আসিয়া নিম্নস্বরে ডাকিল "মা"।

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইতেই সে বলিয়া উঠিল—"একটি মেয়েলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।"

"কোথা থেকে এসেছে সে জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

"জিজ্ঞাসা করেছিলুম. বলে গিন্নি মা'র কাছে বলব।"

"আসতে বল।"

নালুকে আর বলিতে হইল না। মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল সেই স্ত্রীলোক একেবারে রন্ধনশালার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মায়ের আদেশে নালু আবার পাঠের ঘরে চলিয়া গেল।

"তুমিই কি মা গিন্নী ?"

"কোথা থেকে আসছ তুমি ?"

ঝি বলিতে লাগিল। দু'টা কথা বলিতে না বলিতে নির্ম্মলা তার কথায় বাধা দিয়া বলিল—'আমি বুঝেছি। তা আমার কাছে কেন এসেছ ?'

ঝি রাত্রির ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা আবার বাধা দিয়া বলিল—"আমি জানি। কি বলতে এসেছ শিগ্‌গির বল—আমার অপেক্ষা করবার সময় নাই।"

পুলিশ আসিলে বিশু ও তাহাকে রাখু সম্বন্ধে যে কথা বলিতে ব্রজেন্দ্র আদেশ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া ঝি বাবুর মতি ফিরাইতে নির্ম্মলাকে অনুরোধ করিল।

"সে মরে গেছে বুঝলে কি ক'রে ?"

"তা না বলে কি বলব মা ? সেই ভোরে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফিরলো না, ঘরের জিনিষ পত্র চারদিকে ছড়ানো, গহনা পর্য্যন্ত সাবধান ক'রে যায় নি।"

"তা আমি কেমন ক'রে বাবুর মতি ফেরাব ?"

"সে ঠাকুরের যে কোনও অপরাধ নেই মা !"

"সে তোরা বল্‌ছিস্, লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?"

নির্ম্মলার কথার ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ঝি নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত সময় ওই ভাবে থাকিয়া সে বলিল—"তাইত মা ব্রহ্মহত্যা হবে, একটা বেউশ্যের খুনের দায়ে ?"

"তোরা যা জানিস্ ঠিক বললে ব্রহ্মহত্যা হবে কেন !"

"আপনি ওই যে কি বললে মা ! আমাদের কথায় লোকে বিশ্বাস করবে কেন ?"

"করে না করে বামুনের অদৃষ্ট, যে যা কর্ম্ম করেছে তার ফল পাবে। আমার কাছে কেন এলে বাছা! ওসব নোংরা কথা শুনতে আমার ভালই লাগছে না।"

ঝি হেঁটমাথা বার ছুই নাড়িয়া আপনার মনে কি বলিল। তারপর নির্ম্মলাকে একটা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়াই মুখ ফিরাইয়া বলিল "তবে আমার আসার কথা—"

কথা তার শেষ না হইতেই শুভার মা পিছন হইতে ডাকিল—"বৌমা" ঝির আর কথা শেষ করা হইল না। দ্রুত পদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

"ও কে এসেছিল বৌমা?"

"এইত শুনলে মা কেও কাউকে বলতে নিষেধ করছিল। তোমাকে দেখে পালিয়ে গেল।"

"আমাকে বলতে দোষ আছে?"

নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।"

তবু নির্ম্মলা উত্তর দিল না।

"আমাকেও তুমি যেন কেমন সন্দেহ করছ।"

"বললে ওর মনে হয়েছে ক্ষতি হবে। তখন শোনবারই এখন প্রয়োজন কি মা।"

"কেন গা আমি কি পেটের কথা রাখতে পারব না। পাড়ায় পাড়ায় বলতে যাব নাকি?"

"রাখতে কি পেরেছ মা?"

বিস্মিতনেত্রে নির্ম্মলার মুখের পানে চাহিয়া শুভার মা বলিয়া উঠিল—"কইমা, কবে, কার কাছে তোমার কি গোপন কথা বলেছি?"

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল—"ভেবে দেখ মা।"

"তুমিই বলনা।"

"শুভার সঙ্গে ওই ঠাকুরের বিয়ের কথা কয়েছি, ওবাড়ীর গিন্নী জানলে কি করে?"

"একটু লজ্জিতার ভাবে শুভার মা উত্তর করিল—"তাহ'লে আবাগী সরি বলেছে।"

"সরিকে বললে কে? আমি ত তাকে বলিনি মা!"

মুখের ভাবে নিজের অপরাধটা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া শুভার মা বলিল—"তুমিই কি তবে তাকে বিদেয় করে দিয়েছ?"

"বিদেয় আমি করি নি। তবে তাঁর চলে যাবার একান্ত জেদ দেখে নিষেধ করিনি। ধরে রাখলে কি সর্ব্বনাশই না হত মা!"

"সর্ব্বনাশ কি বৌমা?"

"আমাকে ব্রহ্মহত্যার উপলক্ষ হ'তে হ'ত।"

"কি বলছ গো?"

"ও কে তুমি বুঝেছ বলছিলে, কি বুঝেছ বল দেখি?"

"বুঝেছি বলে অপরাধ করেছি মা।"

"অপরাধ কিসের মা? নিশ্চয় কিছু মনে করেছিলে। বলতে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছে।"

"আমি মনে করেছিলুম—" বাস্তবিকই অতি সঙ্কোচে শুভার মা আর বলিতে পারিল না।

"তুমি মনে করেছিলে ভটচাজ্জি ম'শায় ওকে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"ওকি বলছ মা, এরকম মনে আমি করতে যাব কেন!" শুভার মা বলিল বটে, কিন্তু তার মাথা কথাগুলায় সায় দিতে অপারগ হইয়া আপনা আপনি নত হইয়া গেল। আর দু'একটা কথা সে কি বুঝিয়াছিল, বলিবার বৃথা চেষ্টায় নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—"ও সেই মাগীর বাড়ীর ঝি। বলতে এসেছিল, তোমার ছেলে ওই গরীব ব্রাহ্মণকে খুনের আসামী ক'রে পুলিশে ধরিয়ে দেবার মতলব করেছে।"

"তা হ'লে ত ছেলের বড় অন্যায়!"

"পুলিশের কাছে ওদের কি বলতে হবে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে। তাই ও বেটি কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এসেছিল, যাতে আমি তোমার ছেলেকে সে কাজ করতে নিষেধ করি।"

"পণ্ডিত হ'য়ে তার এরকম দুর্ব্বুদ্ধি! তুমি তাহ'লে এখনি গিয়ে নিষেধ ক'রে এস মা! ছি ছি! ব্রজেনের এত বাড়াবাড়ি! নাও এস—তোমাকে সে কি বলবে বলে ব্যস্ত হয়েছে।"

"তোমার কি মত? আমার কি এসব কথায় থাকা উচিত?"

"মতামত নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্রকে এ মহাপাপের কাজ থেকে যে

কোনও উপায়ে ফিরিয়ে আন। ওমা, একি কথা! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—"

উপর হইতে এই সময় ব্রজেন্দ্রের কথা উভয়েরই কাণে গেল। কথায় বিরক্তি, হতাশ, অভিমান—সব যেন একসঙ্গে জড়ানো।

"মা আমি চললুম—আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না। পুঁটি উঠেছে—তাকে তুলে নিয়ে যাও।"

শুনিয়াই শুভার মা বলিয়া উঠিল—"আর দেরি করছ কেন বৌমা? সত্যি সত্যি চলে যাবে!"

"তুমিও যেমন, কোথায় যাবে? খাবে কোথায়? আর কি সে আবাগী আছে! তুমি আগে যাও, ঠাঁইটা কর গিয়ে, আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

ব্রজেন্দ্রের বালকত্বের উপর সমালোচনা করিতে করিতে শুভার মা চলিয়া গেল। আর দেখা না করিলে চলেনা বুঝিয়া নির্ম্মলাও রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। মূর্খ স্বামী সত্যই কি এক নিরীহ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে?

(৪৮)

ব্রজেন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতে আসিয়া বলিব না বলিব না করিয়া এটর্ণী প্রভুর জেরায় সরি একরূপ সব কথাই বলিয়া ফেলিল, রাখুর পূজা করিতে আসার কথা, আসিতে আসিতে মধু ঠাকুরকে দেখিয়া পথ হইতে ফিরিয়া যাওয়ার কথা, নির্ম্মলার আদেশে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে শুভার নাকে আঘাত লাগার কথা, তারপর রাখুকে যত্ন করিয়া বসানো, ব্রজেন্দ্রের নিজের ঘরে আহার করানো,—ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কি রাখুর সঙ্গে নির্ম্মলার ভাই সম্বন্ধ পাতানো—সমস্ত কথা জেরার কৌশলে ব্রজেন্দ্র সারির মুখ হইতে বাহির করিয়া লইল।

সরি বলিতেছিল, শুনিতে শুনিতে ব্রজেন্দ্র উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতেছিল। শিক্ষার সংযম সরির চোখে তার মুখটাকে অরঞ্জিত রাখিলেও ভিতরের উত্তাপটা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, দেহটাকে আর সে স্থির রাখিতে পারিল না। সে বসিয়াছিল, উঠিল। একটা হাত তার বিদ্রোহীর মত একটা ঘ্যান ঘ্যান করা মশাকে শাস্তি দিতে তারই পিঠে বেশ একটু জোরে আঘাত করিল। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য। ব্রজেন্দ্র বুঝিল, তাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত রাখুর এইরকম একটা ঘুসির সঞ্চালনেও ত শুভার নাকে আঘাত লাগিতে পারে।

"পূজারি ঠাকুর আজ আর আসবে না ?"

"মা'ত তাই বললে।"

"সে কোথায় গেছে বলতে পারিস্ ?"

"দেশে চলে গেছে।"

সরির নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত উত্তর ব্রজেন্দ্রের ঈর্ষা-প্রজ্বলিত বক্ষে এক মুহূর্ত্তে একটা যেন হিমনদীর প্রবল প্রবাহ ঢালিয়া দিল।

মুখের ভাব লুকাইতে সরির কাছে থাকাও তার সম্ভবপর হইল না।

"পুঁটির কাছে থাক্ সরি, আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

ভাবগোপনের শত চেষ্টাতেও সরি প্রভুর মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, মা'র মুখে রাখুর প্রস্থানের কথা শুনিয়া তার ও ঠাকুরমার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, প্রভুরও ঠিক তাই হইয়াছে। সমাপরাধের আর একটা সঙ্গী জুটিল দেখিয়া সরি বেশ সন্তুষ্টই হইল। সে একবার বিছানায় ঝুঁকিয়া পুঁটিকে দেখিয়া লইল, অঘোরে বালিকা ঘুমাইতেছে বুঝিয়া ঠাকুরমার কাছে চলিয়া গেল।

শুভার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ব্রজেন্দ্র দেখিল শুভা বালিশে মুখ লুকাইয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া আছে। তাহার বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে বুঝিল শুভা ঘুমায় নাই, পদশব্দে তার আগমন অনুমান করিয়া বালিকা মুখ ঢাকিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র শুভাকে ভালবাসিত। ভালবাসিত শুভা তার একটি মাত্র ভগিনী বলিয়া, তার উপর বালিকা তার বিমাতার কন্যা অল্পবয়সী বিধবার মমতার একমাত্র অবলম্বন। সেই জন্য স্নেহটা তার একরূপ পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রজেন্দ্র এই স্নেহ অভিনয়ের আকারেই ব্যবহার করিত। করিত অতি সঙ্কোচের সহিত, কোনও সময়ে তাহাতে সামান্য মাত্র ও ত্রুটি দেখিয়া যাহাতে তার মা ক্ষুণ্ণ না হয়। ক্রমে সে অভিনয় এতই সত্যে পরিণত হইয়াছিল যে দেখিয়া শুভার মাকে ও সময়ে সময়ে মনে করিতে হইত, সেও বুঝি কন্যাকে ব্রজেন্দ্রর মত ভালবাসে না। অনেকবার সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য মাত্র ত্রুটিতে বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী নির্ম্মলাকেও তার কাছে তিরস্কৃতা হইতে হইয়াছে।

তবু অতি ধীরে ব্রজেন্দ্র ডাকিল—"শুভা !"

শুভা বালিশের ভিতর আরও খানিকটা মুখ ঢুকাইয়া দিল।

"ভয় করতে হবে না তোকে। অন্যমনস্কে একজনের হাত তোর নাকে লেগে গেছে, এতে তোর ভয় কিম্বা লজ্জা করবার কি আছে? যন্ত্রণা কিছু নেই ত?"

শুভা কোন উত্তর দিল না।

"চুপটি ক'রে শুয়ে থাক্, যেন ওঠা নামা করিস্‌নি।" বলিয়া ব্রজেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, ঈর্ষার নেশায় কিছুক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার মনে যে সকল অসচ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সহসা প্রতিক্রিয়ায় সে গুলা তাহাকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিল যে, আপাততঃ নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা করিতে তার মন কিছুতেই সম্মতি দিতে সাহস করিল না।

ইহার পরেই মায়ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহার খাইবার ব্যস্ততা দেখিয়া শুভার মা নির্ম্মলাকে ডাকিতে গিয়াছে।

খাবারের পাত্র হাতে লইয়া নিজের ঘরের দ্বারমুখে প্রবেশ করিয়াই নির্ম্মলা দেখিতে পাইল স্বামী চলিয়া গিয়াছে, আর তার জন্য রচিত আহারের স্থানটির পার্শ্বে চুপটি করিয়া মাটিতে হাত রাখিয়া তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বসিয়া আছে।

"পুঁটিকে নিয়ে গেল কেন?"

"শুভাকে বললুম, সে এসে নিয়ে গেল।"

"তোমারা সকলে মিলে তার নাকটাকে আর সারতে দিলে না দেখছি।" বলিয়াই নির্ম্মলা ঠাঁইটির উপর পাত্রটি রাখিয়া আবার বলিল—"সরপোষ দিয়ে ঢেকে রাখ মা আমি একবার শুভাকে দেখে আসি।"

(৪৯)

চিত্ত স্থির রাখিবার শত চেষ্টাতেও নির্ম্মলা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চোখে নিদ্রা আনিতে পারিল না। সে বুঝিয়াছে, তার বোকা শাশুড়ী পেটে কথা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। তাহার খাবার লইয়া আসিবার পূর্ব্বে যেটুকু সময় পাইয়াছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ী স্বামীকে ঝির কথা বলিয়া দিয়াছে, আর তাই শুনিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। আহার করিবারও অপেক্ষা করিতে পারে নাই।

স্বামীর উপর অভিমান করিবার শত কারণ থাকিলেও সে যে মুখের অন্ন ফেলিয়া চলিয়া গেল, এটা নির্ম্মলা সহ্য করিতে পারিল না। সমস্ত দিনের

ভিতরে সে মুখে কিছু তুলিতে পারিয়াছে কিনা তাহাও ত নির্ম্মলা বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাহাদের যেরূপ নিষ্ঠা, তাহাতে স্বামীর কিছু আহার না করাই সম্ভব। সুতরাং নির্ম্মলার মনোবেদনার সীমা রহিল না।

শাশুড়ীর বলায় ভাল কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয় ভাবিবারও নির্ম্মলা অবকাশ পায় নাই। সে যাহা ঘটিবার ঘটুক, সে শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া কেবল স্বামীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

প্রতীক্ষা করিতেছিল নীরবে। তার শয্যা পর্য্যন্ত তার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারে নাই। দেহ তার এত স্থির। দীপালোক পর্য্যন্ত তার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারে নাই, চক্ষু তার মুদ্রিত। একটি দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত ঘরের বায়ুকে চঞ্চল করিতে তার নাসিকাপথ হইতে বাহির হয় নাই।

নির্ম্মলা ঘরে আজ সরিকে রাখিয়াছে। যাহাতে ইহাদের ভিতরে আর সন্দেহের কণামাত্র প্রবেশ করিবার সুবিধা না পায়। মায়ের জাগরণের কোন ও নিদর্শন দেখিতে না পাইয়া সেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি একটা। দেউড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ যেন নির্ম্মলা শুনিতে পাইল।

"সরি—সরি—ও সরি।"

ধড় মড়িয়া সরি উঠিয়া বসিল।

"দেখ্ দেখি, বাবু বুঝি আসছেন।"

নির্ম্মলার কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা কবাট খোলার শব্দ শুনিতে পাইল।

আর কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। সরি দোর খুলিয়া বাহির হইয়া গেল

নির্ম্মলার ব্যাকুল প্রতীক্ষার মুখে সরি ব্রজেন্দ্রের এক চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল:—

"সারাদিনই একরূপ উপবাসী, তবু ক্ষুধার মুখে চলে এসেছি; তুমি আমার জন্ত খাবার প্রস্তুত করছিলে জেনেও। তুমি যে মর্ম্মাহত হবে এটা বুঝতেও আমার বাকী ছিল না। তবু আমাকে আসতে হ'ল, না এলে আমাকেও চারুর খুনের দায়ে পড়তে হবে ভেবে। কেননা অনেক আগে তার ফিরে না আসার খবর পুলিশকে আমার দেওয়া উচিত ছিল।

অবশ্য এটা আমার ঠিক কৈফিয়ৎ নয়। কিছু মুখে দিয়ে এলে একবারেই যে চলতো না একথা বলতে পারি না।

এ আমার কৈফিয়ৎ নয়। চারুর প্রতি মোহে রাখুঠাকুরের উপর রাগে তোমার কাছে—কাছে বলা ভুল—তোমার উদ্দেশে এমন দু' একটা অপরাধ ক'রেছি, যার কৈফিয়ৎ নাই। হয়ত তুমি তা জান না, আর না জানলেও জানবার জন্ত যে আগ্রহ দেখাবে না, এটা আমার বিশেষরূপই জানা আছে। সেই জন্ত অপরাধটা বড় কর্কশভাবেই আমার মনটাকে পীড়ন ক'রে উঠ্‌লো। তোমার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসার সেও একটা কারণ।

যাক্, পুলিশ আসিয়াছে। আমিও আন্তোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়াছি। যদি চারুর চিঠিখানা দেখাইবার প্রয়োজন হইত দেখাইতাম। প্রয়োজন হয় নাই। পুলিশ চারুর ও রাখুর সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়াছে। পূর্ব্বের একখানা দলিল, চারুর একখানা বাড়া কেনার—তাহাতে চারু ও রাখুর সম্বন্ধ জানা গিয়েছে। তবে তাতে লেখা আছে স্বামী মৃত। তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। পুলিশ বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে, স্বামীকে দেখে সাময়িক উন্মত্ততায় সে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছে। জিনিষপত্র, টাকা, গহনা, সিন্ধুক, বাক্‌সের চাবি যেরূপ ভাবে সে ফেলে গেছে তাতে পাগল হয়ে তার ডুবে মরাই সম্ভব। এইবারে তার সম্পত্তি। কতকটা আগে হ'তেই আমার আয়ত্তে আছে। অবশিষ্ট নিয়ে একটু গোল বাধতে পারে। তার ভাই আছে। আইনে চারুর স্ত্রীধনে সেই অধিকারী। চারুর সেই মাসী বুড়ীর সঙ্গে, শুনলুম সেও রথ দেখতে পুরী গেছে। সে ফিরে এলে, তার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে যা হ'ক একটা ঠিক করব। তবে এটা ঠিক জেনো, এ বাড়ী আর বাড়ীতে কাছে আমার যা আছে, সেটা রাখু ঠাকুরের পাওয়াই হয়ে গেছে। অধিক আর লিখলুম না। পুলিশ সমস্ত জিনিষের লিষ্ট করে চলে গেল। বাড়ী আগলাতে দু'জন পাহাড়াওয়ালা রেখে গেল। আমাকেও এ রাত্রিটা থাকতে হ'ল। একান্ত অনাহারী আছি মনে ক'রে চিন্তিত থেকোনা।

এইবারে লিখতে পারি

অনুতপ্ত তোমার ব্রজেন্দ্র।

পুঃ রাখু সম্বন্ধে তোমার যে আর একটা সঙ্কল্প, সেটার সম্বন্ধেও আমি চিন্তা করছি। ইতি—

পড়িতে পড়িতে নির্ম্মলার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেটা লক্ষ্য করিয়া উঠিল—"খবর ভালত মা?"

ঠিক এই সময়ে শুভার মা দ্বারদেশে আসিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"বৌমা !" উত্তরে নির্ম্মলা বলিল—"ভিতরে এস মা ।"

"ছেলে এলো বলে বোধ হ'লনা ?" বলিয়া শুভার মা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

"না মা, আসতে পারবে না বলে চিঠি পাঠিয়েছে" বলিয়াই নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে আবার বলিল—"তোমাকে কোনও কথা বলা দায় দেখছি যে মা, কিছু পেটে রাখতে পার না।"

"আবার কি বলেছি গো।"

"আমার ননদের সম্বন্ধের কথা তোমার ছেলেকে শোনালে কে ?"

"ছেলে কি রাগের কথা লিখেছে নাকি ?"

"তা আর লিখলে কই ? লিখলে ত ভালই হত।"

"তা হলে ব্রজেন্দ্রের মত আছে ?"

"মতামত টাকা মা ! তোমার ছেলে কি সে আবাগীর অতগুলো টাকা হাতছাড়া করবে !—যাও, শোওগে। দেখো যেন মেয়ের কাছে পেটের কথা বার ক'রে দিও না। শুনলে তার নাকের ফুলো বেড়ে যাবে।"

"ওই সরি বলেছে মা !"

কৃত্রিম ক্রোধে এইবারে সরি বলিয়া উঠিল—"নাও মা চিঠি মুড়ে শুয়ে পড়। সব সরি বলেছে, আর কেউ বলেনি, বলতে জানেও না।"

* * * *

পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে বাহির হইল, সাতশত যাত্রীসমেত সেণ্টলরেন্স জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।"

রাণাপ্রতাপ

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

যুগ যায়, যুগ যায়!
অনন্তের তরঙ্গ লীলায়
বুদ্বুদ সমান উঠে মুহুমুহু গেল টুটে কত
কত রাজ্য, রাজা লক্ষ শত ;
জয়রব অস্ত্র ঝনৎকার সহিল না কালের ফুৎকার,
নিভে গেল নিশান্তের ক্ষীণ তৈল মৃৎপ্রদীপ শিখা—
বিজয়ীর মিথ্যা অহমিকা ;
কোহিনুর হোল চুর,
ময়ুর আসন সহিল না কালের শাসন।

যায় যুগ, যুগ যায়!
নিয়ে যায় আবর্জ্জনা প্রায়
কালের সে শতমুখী পৃথিবীর প্রাঙ্গণ হইতে
মণি রত্নে বর্ম্মে ঢাকা সহস্র-সেবিত রাজ দেহ ;
হীরক খচিত রাজগেহ
তাসের প্রাসাদ সম কালের তুড়িতে উড়ে যায়।

মাত্র অবশেষ নাম,
বালকের কুতূহল, বিদ্বানের চর্চ্চার আরাম ;
আর কিছু নাই—
বন্দীরা না গাহে স্তুতি, বন্দিনীরা নতি নাহি করে,
রঙ্গিণীরা নৃত্যে নাহি ঘেরে সম্রাটেরে,
শুদ্ধ সব। শব্দহীন কালের সভায়
বিচার প্রার্থীর প্রায়
দলে দলে দাঁড়াইয়া মূককণ্ঠ মূর্ত্ত অত্যাচার,
জঘন্য লিপ্সার যত ক্ষুদ্র বিগ্রহের দল

কালের সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি সম্মুখে
কম্পমান স্তব্ধ নতমুখে।

তার মাঝে হে সন্ন্যাসী বীর
তুমি ঊর্দ্ধশির,
মৃত্তিকা পিণ্ডের মাঝে স্যমন্তক সম দ্যুতিমান্
কাল সভাতল করিয়া রেখেছ সমুজ্জ্বল।

একদিন যারা
বন হ'তে বনান্তরে খেদাইয়া বার বার করি গৃহহারা,
রণবলে ধনবলে চূর্ণিবারে চেয়েছিল
দুর্নিবার শকতি তোমার,
রাজ সম্পদের পণে
কিনিতে চাহিয়াছিল হে দরিদ্র তোমার সম্মান,
কোথা আজ তাহাদের স্থান?

কোথা গেছে সে রাজসম্পৎ,
গজ অশ্ব পদাতিক স্বর্ণময় লক্ষ রণরথ?
কালের আবর্ত্ত মাঝে কোন্ দিন হারায়েছে পথ
বৈভবের তুচ্ছ ধূলিকণা,
স্মরণে আসে না।

শুধু রয়েছে জাগ্রৎ
আপন প্রভায় দীপ্ত দারিদ্র্যের সাধনা তোমার
সহস্র বিপ্লব অবহেলি।
নৃপতির শিরোভূষা চিরকাল ধরি
কাল চলে পদতলে দলি,
ইঙ্গিতে থামায়ে দেয় বিজয়ীর জয়ডঙ্কারব,
শুধু নিঃস্ব তাপসের চীর,
তাঁহার ত্যাগের মুক্তিবাণী—
বহি আনে সর্ব্বধ্বংসী যুগ হ'তে যুগান্তর মাঝে
মানব সমাজে।

একদিন কলঙ্কের ঘন মেঘস্তূপে
ভারতের ভাগ্যাকাশে আদি অন্ত ছিল আবরিয়া ;
তূর্ণ বিদারিয়া
সে আঁধারে জেগেছিলে তুমি বজ্রশিখা,—
আঁধার ভারত-ভালে বহ্নিশুচি শুভ্র ললাটিকা।

বিলাসীর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গি রুদ্র রবে,
বজ্রানলে দগধিয়া নৃপতির রূঢ় অহঙ্কার,
শক্তিরে বিদ্রূপে বিঁধি
সর্ব্বত্যাগী তাপস আত্মার
জেগেছিলে অম্লান প্রকাশ।

মদগর্ব্বে আত্মহারা ভোগে অন্ধ বিলাসীর আঁখি
তোমারে নিরখি
মুহূর্ত্তে ঝলসি গেল। চারিদিক হ'তে
গ্রাসিতে গর্জ্জিয়া এল রাজবল শতমুখ স্রোতে।
সে তরঙ্গাঘাতে অনধীর
জলধির দীপ স্তম্ভ সম ঊর্দ্ধশির
দাঁড়াইয়া ছিলে মহাবীর,
ফেণায়িত অন্ধকারে বিচ্ছুরিয়া দিগ্ দিগন্তরে
জ্যোতিঃ শিখা শুভ্র শুচিতম,—
অন্ধকারে লক্ষ্যহারা তরণীর দীপ্ত ধ্রুবতারা।

শুধু গিয়েছিল ভাসি
সে তরঙ্গস্রোতোবেগে সম্পদের শুষ্ক পর্ণরাশি—
তোমার প্রাসাদ, দাসদাসী।
তোমারে স্পর্শেনি কেহ হে সন্ন্যাসী, সর্ব্বকামনার
সকল বৈভব ভস্মে অঙ্গরাগ রচি আপনার
প্রলয় তাণ্ডব মাঝে ছিলে বিরাজিত
চিদানন্দ ধূর্জ্জটির মত।

চারি ধারে বিলাসের লালসার লীলা,
তার মাঝে মত্তি অবিচলা—

দেশ মাতৃকার পায়ে রাখি,
দুঃখ দৈন্য অনশন অত্যাচারে নিয়েছিলে ডাকি
নিত্যকার সহচররূপে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া যে লিখন গিয়াছিলে আঁকি
ভারতের ইতিহাসে, মুছিয়াছে সেকি
কালের করাল কবলেপে ?

সর্ব্বসুখ ভোগেন্ধনে যে যজ্ঞ অনল জ্বলিয়াছে
একদিন হিন্দুস্থানে,—এতদিনে সে কি নিভিয়াছে ?
তোমার সে উদগ্র সাধনা
একি ব্যর্থ হ'য়ে গেছে—এ ভারতে হে প্রতাপ রাণা ?

নহে, নহে, নহে,
ভারতের চিত্তদ্বারে ঝঞ্ঝাসম আজ দেয় হানা
জীবনের সাধনা তোমার,
তব যজ্ঞানল শিখা
জ্বলিয়া উঠেছে পুনঃ আহিমাদ্রি কুমারিকা
উদ্ভাসিয়া সারা হিন্দুস্থান।
ভারতের প্রাণে আজি বিস্তৃত তোমার অধিকার
জীবনের তপস্যার এই শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।

কোটিপতি আজ—
হর্ম্ম্য ত্যজি নামি আসে চণ্ডালের কুটীরের মাঝে
ভিখারীর সাজে
লেশমাত্র নাহি মানে লাজ ;
কুলবালা করে আলা কারার নিবিড় অন্ধকার ;
বরপুত্র কমলার ভিক্ষাপাত্র করপুটে বহে,
হাসিমুখে অনশন সহে ;
বালক ছুটিয়া আসি জননীর বাহুবন্ধ হ'তে
আঘাতের নীচে মাথা পাতে ;

মায়ের পূজার অর্ঘ্য কুলী নিয়ে আসে আজি—
জীবনের মজুরীর পুঁজি ;
ক্ষুধিত সহাস্যমুখে বহি আনে তার অন্নগ্রাস—
এর মাঝে তোমারি প্রকাশ।
আজ হেরি তোমার সাধনা
ভারতের সর্ব্বজনে, কর্ম্মে জ্ঞানে মূর্ত্তিমান্, হে প্রতাপ রাণা।

ঘৃণাহতা

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

(শ্রীভক্তেন্দ্র নাথ রক্ষিত)

অরুণের কথা।

নদীর প্রবলটানে যখন ভাঙ্গন ধ'রে তখন তার ধারের জমীগুলো নিমেষের মধ্যেই অদৃশ্য হ'য়ে যায়। আমারও যৌবন জলতরঙ্গ যখন নীচের দিকে নাম্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল তখন কোন বাঁধাই সে মানেনি। নিরুর সেই শেষ দিনের চাউনি, ঘাটের কোলে থম্‌কে দাঁড়ান জলের মত আমায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ যেমন ঘাটের কোলে থম্‌কে দাঁড়িয়েই—অনন্ত ঢেউয়ের সঙ্গে সমুদ্রের বুকে ঝাপিয়ে পড়বার জন্যে ছুটে যায়—তেমনি আমার এই পর-পদ-দলিত লাঞ্ছিত মন মুহূর্ত্তের জন্যে বিবেক ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আবার পাপের সমুদ্রে ঝাপিয়ে প'ড়েছিল। * *

সন্ধ্যায় শ্যামলা বসুমতীর ললাটে ভানুর রক্তিম আভা যেমন বিশ্বমানবকে মুগ্ধ ক'রে তেমনি করে যেদিন বধূর বেশে শত কোলাহলের মধ্যে মলিনা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল; সেদিন মনে হ'য়েছিল সেই সতীরাণী নিরুকে। এমনি একরাত্রে উৎসবের মাঝে নিরুও আমায় আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময় নিরুর চোখ দেখে বেশ বুঝেছিলুম যে সে এতক্ষণ কাঁদ্‌ছিল। সেই যে তা'র কান্না আরম্ভ হ'লো, সারা জীবনে বুঝি সেই পরম বন্ধুটীকে রেহাই দিতে সে পারেনি। এমন দিন তা'র ছিলনা—যেদিন, আমার উপেক্ষা অনাদরে, সে চোখের জল্ ফেলেনি। বর্ষার অশ্রুমুখী আকাশের মত সারা

জীবনটা সে কেঁদেছে। বৌউদির অনুরোধে আর আমার রূপপিপাসার উত্তেজনায় মলিনাকে আমি বিয়ে করেছিলুম। এ বিয়েতে বাবা উপস্থিত ছিলেন না, তখন তিনি কাশীতে—দাদা গিয়েও তাঁকে আন্‌তে পারেননি।

মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত সেই অবগুণ্ঠিতার রূপ জ্যোতিঃ অনুকূল বাতাস লাগা আগুনের মত রূপের পিপাসা আমার জাগিয়ে দিলে। ফুলশয্যার রাত্রে সোহাগভরে যেমন তার হাতখানি ধরেছি, অমনি সর্পাহত পথিকের মত চম্‌কে সে খাট থেকে নেবে পড়্‌লো। আত্মবিস্মৃতা নারীর লজ্জার আবরণ খ'সে গেল—আঁধার ঘরে আলো জ্বালার মত মুখখানি তার জ্বলে উঠ্‌লো আমার নিমেষ হা'রা চোখের উপর তা'র আগুনের গোলার মত চোখ দুটী রেখে ব'ল্লে "আমার গায়ে হাত দিওনা, দেবার অধিকার তুমি রাখনি, মনে ক'রোনা শুধু দুটো মন্তর আউড়ে ষড়যন্ত্র ক'রে তোমরা আমার জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবে! এর পরও যদি তুমি আমার গায়ে হাত দাও—আমি পাড়া-শুদ্ধ লোক ডেকে কেলেঙ্কারী কর্ব্বো, বলে রাখছি"। এই কথা ব'লে সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল। আর আমি; চুপ ক'রে পঙ্গুর মত ব'সে একটা বালিকার চোখরাঙ্গানি সহ্য কল্লুম।

মলিনার কথা।

যেদিন আমার নারীজীবনের সব আশা পায়ে দ'লে এক নারীহন্তা, মদ্যপায়ী যুবকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল—সেদিন সত্যই আমার মর্ত্তে ইচ্ছা হ'য়েছিল। তবে নাকি লোকে ব'লে আমার কপালে অনেক সুখ আছে; তাই এ যাত্রায় রক্ষা হয়েছিল। ছেলেবেলাকার নভেল-পড়া মগজে এ বর আমার পছন্দ হয় নি। সমবয়স্কা মেয়েরা যে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বলবে—আমার স্বামী মাতাল—এ আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বোনা। দিদির দেওর ব'লে তো' তা'কে চিনতুমই আরো বেশী ক'রে চিনতুম নিরুর বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখের উপর দুটো উদাস ভরা চাউনির অর্থে। জেনে শুনে দিদি যে আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে—এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দিদির এই দেওরটীকে ছেলেবেলায় আমি বেশ একটু ভক্তি কর্ত্তুম, আর সেই ভক্তিটুকু একটু উঁচুতেই বুঝি উঠছিল। কিন্তু চোখের সাম্‌নে যখন নিরপরাধা বালিকাকে মেরে ফেলতে দেখলেম, তখন আমায় সবখানি হৃদয় জুড়ে একটা ঘৃণা জমাট বাঁধতে লাগলো। তারপর যখন শুনলুম ওই নারীহন্তা, মদ্যপায়ী

যুবকের খেয়ালের সঙ্গে আমার জীবনসূত্রটা বেঁধে দেওয়া হবে, তখন ঘৃণায় আমার সমস্ত বুকখানা যুদ্ধশেষে রণক্ষেত্রের মত বিশৃঙ্খল হ'য়েছিল। তারপর বিয়ের পর সকলের উপর উপেক্ষা ও অনাদর পূর্ণমাত্রায় দেখান সুরু হ'লো—দিদি শুদ্ধ কেউ বাদ গেল না। সেকালের কথা ছেড়ে দিলেও এখন অনেক এমন মেয়ে আছে যা'রা পিশাচ স্বামীকে ভালবাসে ভক্তি ক'রে। কিন্তু আমি এমন অস্বাভাবিক ভালবাসতে শিখিনি—তাই আমার সগর্ব্ব ব্যবহারে এঁদের সংসার দিব্বি ভাঙছিল আর আমিও ত তাই চাই। এ বাড়িতে যখন স্বত্ব ঠিক ক'রে ঢুকেছি তখন আমার ছিল ঘোমটাটানা ঘাড়হেঁটক'রা লজ্জাবনত মুখী বধূর মধুর বেশ—আর যখন বেরুবো তখন রণচণ্ডীর মত চোখ রাঙ্গিয়েই বেরুব, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। তোমাদের সনাতন নিয়ম হয়ত ব'লবে, নারীর ধর্ম্ম সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমি বলবো শক্তিময়ী নারী অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে—শুধু প্রতিবাদ করেই সে ক্ষান্ত হয় না—প্রতিকার করে। ইতিহাস উল্টে দেখ তা'র পাতায় পাতায় নারীর শক্তির পরিচয় পা'বে। পুরুষে বলছে আমরা শক্তিহীনা। কেন তা'রা আমাদের কোন্ শক্তির অভাব দেখেছে? নারীর শক্তি ছাড়া সংসারে কোন্ কাজটা হয় তোমরা বলতো। বিশ্বাস ক'রোনা পুরুষের ওই ভিত্তিহীন মন্তব্যে। নিজেকে শক্তিময়ী ব'লে ভাব দেখি, বিদ্যুৎ বিকাশের মত শক্তি তুমি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্ব্বে। পাশ্চাত্য নারীরাও নারী, তোমরাও নারী; তা'দের মধ্যে যদি শক্তির লীলা সম্ভব হয়, তোমাদের মধ্যে তা সম্ভব হবে না কেন? নিজের শক্তিকে ছোট ভেবেছ বলেই তো তোমরা শক্তিহীনা। নিজেকে বড় ভাব বড় হ'বে। অমন ক'রে ঘরের কোণে থেকে শক্তির অভাব মনে কর্ল্লে শক্তিহীনা হ'বে না ত হবে কি?

অরুণের কথা।

মলিনা বড় বাড়িয়ে তুলেছে তা'র সগর্ব্ব ব্যবহারে চাকরেরা পর্য্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে—বৌউদি তো হবেনই। সেদিন কাঁদ্তে কাঁদ্তে বৌউদি এসে বল্লেন—মলিনা তাঁকে আলাদা হ'তে বলেছে। আমি স্পষ্ট তাঁকে বল্লুম "বেশ তো—তা' হ'লে ঝগড়ার পালা বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে—আলাদাই হও না।" কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে বৌদি চ'লে গেলেন। আমার মনে হ'লো আর একদিনের রাত্রের কথা—সে দিনও বৌদি কাঁদ্তে

কাঁদ্‌তে বলেছিলেন "অরু! তো'র বৌ আমায় অপমান কল্লে।" সেদিন এই মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার মান কিসের বিনিময়ে রেখেছিলুম—নিরুর মুখের রক্তে মান রেখেছিলুম বৌদির—আর আজ তাঁর চ'খের জলে মান রাখলুম মলিনার! এই অন্যায় কথাটা বলতে মলিনাকে বারণ কর্ব্বো এ সুৎসাহসটুকু আজ আমার নেই। পাছে মলিনার পদ্মের মত চোখ দু'টি ফেটে জল প'ড়ে এই ভয়ে। হায় মোহ! সেই রূপহীনা নিরুর বিষাদক্লিষ্টা মুখখানার দিকে একবারও ফি'রে চাইনি। তাই আজ অতীতের সেই জীবন্ত স্মৃতি দুর্ভিক্ষপীড়িত শিশুর মত আমার হৃদয়ে আঘাত কর্চ্ছে। আজ শিমুল ফুলের তীব্র রংটার উপর নজর পড়েছে আমার; যতটা না নজর পড়েছে উপরের ঐ বিরাট কাল মেঘের দিকে। আস্তে আস্তে, আমার ভাবনার দড়ি ছিঁড়ে দিয়ে; সমুদ্রের মত গাঢ় নীল রংয়ের সাড়ী পরে—মেঘের মত ঘন-কৃষ্ণবর্ণের চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে—সাম্‌নে এসে দাঁড়াল মলিনা। এই কি স্নেহময়ী নারীর মূর্ত্তি? না—বিভীষিকাময় শ্মশানে রক্তলোলুপ শকুনির মূর্ত্তি। এ ফুল কি পদ্মের মত উপভোগ্য না কিংশুকের মত ঘৃণ্য? এ জল কি নদীর জলের মত সুমিষ্ট—না পয়ঃপ্রণালী নিঃসৃত জলের মত দুর্গন্ধ। কে বল্‌বে এ কি? মলিনা তা'র চির অভ্যস্ত মধুর হাসি ঠোঁটের কোলে এনে অপূর্ব্ব কৌশলে ঢেকে নিয়ে বল্লে "তোমার কি হ'য়েছে—মুখখানা শুক্‌নো কেন?" একটু হেসে আমি বল্লুম "কৈ-কিছু না" তা'র একমুঠো ফুলের মত হাতের উপর আমার হাতখানা রেখে বল্লে—"শোবে, এস অনেক রাত হ'য়ে গেছে।''

মলিনার কথা

দিদিকে আলাদা ক'রে দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে নিজের ঘরে "গিন্নি" হ'য়ে—দার্জ্জিলিং এ হাওয়া খেতে এসেছি। বেশ জায়গা এই দার্জ্জিলিং; মেঘের সঙ্গে এমন ঘরের ভেতর খেলা করা বেশ আমোদজনক। আমাদের পাশের বাড়ীতে বিমলেন্দু বাবুরা থাকেন, বেশ ভদ্রলোক তাঁরা। কেমন নির্ম্মল ব্যবহার তাঁদের। কিন্তু হিন্দু-সমাজের এমন দুর্ভাগ্য যে, এম, এ পাশ করেও পুরুষগুলোর মনের সঙ্কীর্ণতা যায় না। বিমলেন্দুর সঙ্গে আমায় বেড়াতে দেখলে—দিদির এই অশেষ গুণনিধি দেওরটী অগ্নিশর্ম্মা হ'তেন—আবার উৎকট "আর্য্যামির" বক্তৃতাও দেওয়া হ'ত। এ নিয়ে প্রায় আমার সঙ্গে ঝগড়া হ'ত।

সেদিন শরীরটা বুঝি খারাপ ছিল, বেড়াতে যাওয়া হয়নি—আব্দার হ'লো তুমিও যেয়ো না। কেন হে বাপু তোমার শরীর খারাপ, তাতে আমার কি! আমি যখন কিছুতেই তাঁর আব্দার রাখলুম না—তখন সঙ্গে দিলেন এক মরুভূমি দেশের দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে। বিমল, আমি আর তাঁর ছোট বোন ইভা তিন জনে বেড়াতে বেরুলুম। যেখানেই যাই, পাঁড়েটা তার লম্বা দাড়িটা নিয়ে ঠিক পেছনেই আছেন। বিমল বিরক্ত হ'য়ে তা'কে আস্‌তে একবার বারণ ক'ল্লে সঙ্গে সঙ্গে সে তা'র বাজখাঁই গলায় উত্তর যা দিলে—তা'র ভাবার্থ হচ্ছে যে—সে তা'র চাকর নয়, অতএব তাঁর আদেশ মান্‌তে বাধ্য নয়। আমি চোখ রাঙ্গিয়ে বারণ কল্লুম—সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—বাবুর হুকুম আছে আমায় সঙ্গে থাকতে। ইভা হেসে বল্লে, "পাছে এমন স্বর্গের পরীটাকে নিয়ে কেউ উধাও হয় এই ভয়ে—বুঝলে না মলিনা?" বিমল বল্লে "ছিঃ, লেখাপড়া শিখে মানুষ এমনও হয়।"

অরুণের কথা

দার্জ্জিলিংএ এসে মলিনার ব্যবহার বড় বিশ্রী লাগচে। বিমলেন্দুর সঙ্গ আমি ততটা পছন্দ করি না। মলিনা কিন্তু তাদের সঙ্গে সমস্ত দিন বেশ কাটায়। কিছু বল্‌বার উপায় নেই—তা'হলেই অম্‌নি রসাতল। আমাদের সমাজে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই, তখন কেন অত মেশামিশি। হ'তে পারে এটা আমার সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়—এতটা রক্ষণশীল ছিলুম না আমি। আজ কাল এদের মেলা মেশাটা যেন কেমনতর ব'লে মনে হ'চ্ছে। সেদিন বিকেলে বিমলেন্দুর সঙ্গে বসে গল্প কচ্ছি—খবর পেয়ে ভেতর থেকে মলিনা বেরিয়ে এলো। বিমলকে নমস্কার ক'রেই বল্লে "চলুন বেড়িয়ে আসি।" তারপর আমার দিকে একটা লম্বা ফর্দ্দ ফেলে দিয়ে বল্লে "এ জিনিস ক'টা আনিয়ে রেখো—তুমি শুনে নিশ্চয় আনন্দিত হবে যে বিমলবাবুদের আজ নেমন্তন্ন করেছি।" আমায় আনন্দপ্রকাশ কর্‌বার সময় না দিয়েই, তারা বেড়াতে চলে গেল। হায় নারী! বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রবার ক্ষমতা তোমার আছে—কিন্তু আমার নেই। আমায় উপেক্ষা ক'রে বন্ধুকে তুমি খাওয়াতে পার, কিন্তু তোমায় উপেক্ষা ক'রে আমি কা'কেও খাওয়াই নি। স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই নারী! আছে শুধু অর্থের সঙ্গে। তুমি তো জান না কতটা বেদনা আমার এই বুকখানায় জমে আছে। তুমি তো বোঝ না

তোমার বাক্যে, তোমার ব্যবহারে কেমন ক'রে তিল তিল ক'রে আমি মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছি। যে প্রাণ ঢেলে সেবা কর্ত্তে জান্‌তো—যে চোখের জলের কারণ খুঁজতো—যে প্রাণ দিয়ে আমার বেদনা মোচন কর্ত্তে পার্‌তো—সে আজ নেই। সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস আজ জলন্ত আগুনের মত আমার এই দীর্ঘ পথে বাধা দিচ্ছে। আজ এই সুদূর প্রবাসে কা'কে আমার এ ব্যথা জানাব। কাকে আমার ব্যথার ব্যথী ক'রব! সে যে অনেক দূরে। আজ যে আমায় ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ওগো তুমি যেখানে থাক এস, একবার ফিরে এস। ওগো একবার ফিরে এস!

মলিনার কথা

আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। আকাশের গায়ে তাসের প্রাসাদ বাতাসে ভেঙ্গে পড়েছে। আমার গর্ব্ব, আমার অহঙ্কার, আমার নারীত্ব সব বন্যার জলে ভাসা খড় কুটোর মত ভেসে গেছে। প্রভাত আলোকে ফুটে ওঠা সৌন্দর্য্যময়ী রক্তজবা কালবৈশাখীর ঝড়ে ছিঁড়ে পড়েছে। পূর্ণিমার শ্যামলা বসুমতীর বুকে লুটিয়ে পড়া চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর উপর রমণীর এলায়িত কুন্তলের মত বর্ষার মেঘ আঁধার ছড়িয়ে দিলে। বিমল! বিমল!! ঘুম ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে আজ একি শুনালে? নারীর মাতৃত্ব ভুলে তার রূপযৌবনটা ও পিশাচত্বটা কেন বড় দেখলে? কেন ভুলে গেলে যে এই নারী তোমার মা—তোমার ভগিনী। আজ ভাই হয়ে বোনকে একি কথা শোনালে বিমল! বাংলার তরুণ-প্রাণ তোমরা—সমস্ত দেশটা যে তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছে।

আজ তার বুকে একি শক্তিশেল হান্‌লে ভাই! এই জন্যেই কি আমার দেবতা, বিমলের সঙ্গী ভালবাসতেন না। ওগো ত্রিকালদর্শী ঋষি আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা করো। জানি আমি ক্ষমার অতীত—তবু জানি তুমি আমায় ভালবাস। আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই স্বামী—আমায় ক্ষমা করো।

অরুণের কথা

আজ বুঝি দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হলো। আজ বুঝি স্বর্গ নরক এক হ'ল। তা নইলে সেই চিরগর্ব্বিতা মলিনা—তার একি পরিবর্ত্তন! বিমল! তুমি আমার বন্ধুর কাজ করেছ। দুটি বিভিন্ন পথগামী নদীর মিলন ঘটিয়ে স্রোতের

বেগ দ্বিগুণ করে দিয়েছ। আমাদের এতদিনের মনোমালিন্য সব তোমার এক খানি অবৈধ প্রেমপত্রে মুছে গেছে। তোমার চিঠিখানা হাতে নিয়েই যখন মলিনা ঘরে গিয়ে খিল দিলে, তখন জানতুম না এতে কি আছে, জানলে পড়তাম না। কিন্তু মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নয়। তুমি ঠিক লিখেছ "যে যাকে চায় সে তাকে পায় না কেন? চাতক জল চায়—পায়ও বটে কিন্তু অনেক দেরিতে। কিন্তু ভ্রমরের কি ভাগ্য! ফুলের গন্ধ তাকে যেচে ডেকে নিয়ে মধু খাওয়ায়। মলিনা! তুমি যদি পদ্ম হতে—আর আমি যদি ভ্রমর হতুম—" তা হয় না বিমল, বিধির এ বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম তো হবে না। বিমল! মলিনাও পদ্ম হবে না—তুমিও ভ্রমর হবে না—শুধু নিজের বিষে সারা জীবনটা জল্‌বে। জেনেশুনে কেন এমন বিষ আকণ্ঠ পান কল্লে বিমল। না, তোমারই বা দোষ কি, আমিও একদিন রূপের মোহে অনেক কীর্ত্তিই ক'রেছি। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা। মাথাটা একটু ঠিক ক'রে নিয়ে মলিনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম—একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেতর থেকে এসে শেলের মত আমার বুকে বিঁধলো। আমি দরজা খুলে দিতে বল্লুম—কিন্তু তার কোন উত্তর এল না, সমস্ত নিস্তব্ধ—যেমন প্রবল ঝড়ের পরে সমস্ত পৃথিবী নিঝুম হয়ে যায়, সেই রকম নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ কচ্ছিল। এত নিস্তব্ধ যে তাতে নিশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল। তারপরে হঠাৎ সে দরজা খুলে এসে আমার পা ছ'টো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে "আমায় ক্ষমা ক'রো, আর কখন তোমার অপমান করব না।" এই সেই মলিনা যা'র গর্ব্বে—একদিন মাটীতে পা পড়তো না, এ সেই মলিনা। না এ আর সহ্য হয় না, তুমি যেখানে থাক নিরু, আমায় ক্ষমা ক'রো। মলিনার এ দীনহীন বেশ আমি দেখতে পারি না। স্বর্গ থেকে আমায় ক্ষমা ক'রো দেবী!

* * *

দিন কতক পরে একদিন দুপুরে মলিনার ঘরে গিয়ে দেখি মলিনা ঘুমুচ্ছে—সামনে তার খোলা একখানা চিঠি। চিঠিখানা বৌদি কল্‌কাতা থেকে লিখছেন—মলিনাকে।

শ্রীশ্রীদুর্গা ২০শে বৈশাখ
শরণম্। বুধবার।

স্নেহের বোন মলিনা,

তোর গত ১৮ই তারিখের চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। আমার

কাছে তুই ক্ষমা চেয়েছিস্—কিন্তু বাস্তবিক দোষ করেছি আমি। নিরু আমার ভালবাসতো ঠিক, বড় বোনের মত—কিন্তু তবু আমি তাকে দেখতে পার্ত্তুম না—কেন জানিস্? আমার ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেব—কিন্তু যখন তা হল না—আমার সাধের স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে দিলে একটা গরীবের কুৎসিতা মেয়ে, তখন আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্তে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মাল—আর তারই জন্য একটি নিরপরাধা বালিকাকে বলি দিলুম। শেষ আমারই জেদ বজায় রেখে ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম। কিন্তু যখন তোরা আমায় আলাদা করে দিলে তখন আমার বুকখানা যে কি রকম ক'রে উঠেছিল তা বলে আজ আর তোমাদের এই মিলনের দিনে কষ্ট দেবনা বোন। তুই লিখেছিস্ "আবার আমরা তোমার কোলে ফিরে যেতে চাই; ছেলে বেলার মত আমাদের দুজনকে কি কোলে নেবে না দিদি!" তোদের যে কোন দিন ভুলতে পারিনি দিদি। বড় ভালবাস্তুম—পাছে তোদের অমঙ্গল হয় এই ভয়ে চোখের জলও অতি কষ্টে একবিন্দুও যে ফেলিনি বোন। তোরা ফিরে আয় দিদি। আমরা নিঃসন্তান—তোরা দুজন যে আমাদের ছেলে মেয়ের মত বোন।

তোর ভাসুরও বলেছেন তোরা ফিরে আয়। ঠাকুরপোকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলিস্ যে "তোরা ফিরে এলে, আমরা বড় সুখী হব।" আজ আর বেশী লিখতে পাচ্ছি না আশীর্ব্বাদ করি তোদের এ শুভ মিলন চিরস্থায়ী হোক্। পূজার সময় বাড়ী আস্তে ভুলিস্ না।

ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা তোর

"দিদি"

চিঠিখানা প'ড়ে মলিনার মুখের দিকে তাকালুম—ঘুমের ঘোরে সে একটু হেসে উঠলো—জননীর মুখে চুম্বনরত শিশুর মত।

সমাপ্ত।

কবি

[শ্রীসত্যকুমার মজুমদার]

(১)

নিদাঘ সায়াহ্নে গ্রাম্য তরুণীরা যখন ছোট ছোট কলসী কক্ষে দলে দলে নদীর ধারে যাইয়া গল্প জুড়িয়া দিত, সরোজ তখন তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে যাইয়া তাহার অর্দ্ধ মলিন জামাটা গায়ে দিত—ছোট একখানা কাঠের চিরুণী দিয়া কোঁকড়ান চুলগুলি বেশ পাট করিয়া লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া পড়িত। সন্ধ্যা বেলায় বেড়ানটা ছিল তার মস্ত একটা বাতিক। ঠিক ঐ সময়টায় তার মাথায় কি এক খেয়াল চাপিয়া যাইত, সরোজ জোর করিয়াও তাহা দমন করিতে পারিত না।

সরোজের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোনরূপে পরিবার প্রতিপালন করিতেন। চিরদিন সরোজদের অবস্থা এমন মন্দ ছিল না, একদিন তাদের অন্নেও অনেক দরিদ্র প্রতিপালিত হইত, কিন্তু সেদিন আর তাহাদের নাই। সরোজ আজ অন্তের দ্বারে অন্নের কাঙ্গাল। ছোট বেলা হইতেই শিক্ষার দিকে সরোজের বড় ঝোক্। গ্রামে বড় স্কুল না থাকায় দরিদ্র তারাপদ চট্টোপাধ্যায় পুত্রকে রামনগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া নিকটস্থ কোন স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ছাত্র হিসাবে সরোজ মন্দ ছিল না। বাল্যকালে সে সুখের ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছে। তখন সে ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়া পাড়ায় আর দশ জনের সঙ্গে বুক ফুলাইয়া চলিত। কিন্তু এখন সে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র,—একটি মাত্র জামা তাও অর্দ্ধছিন্ন,—অন্যের পরিত্যক্ত একজোড়া ছেঁড়া চটী পায়ে দিয়া সে স্কুলে যাইত। এত যে তার অভাব অভিযোগ,—তাতেও সে নিজেকে কখনও দরিদ্র বলিয়া মনে করিত না। এমনি করিয়াই তার পাঠ্য জীবনটা সে অভাবের সঙ্গে লড়িয়া অবাধে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

সরোজ মনে করিত, সে কবি। সমপাঠী মহলে সে কবি বলিয়াই পরিচিত ছিল। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সে ছোট ছোট কবিতা লেখা অভ্যাস করে। গল্প লিখিবার ঝোক্ ও তার কম ছিল না। কিন্তু তাহাতে সে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে অনেক দিনের কথা—যখন তার

বয়স মাত্র দশ এগার বৎসর সে কাশীদাসের মহাভারত অবলম্বন করিয়া এক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নাম দিয়াছিল 'রাজসূয় যজ্ঞ'। তা ময় দানবের সভাবর্ণনাতেই তার অনেক কাগজ খরচ হইয়া গেল। ওদিকে সে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন ভাগ পড়িতেই দেখিতে পাইল "রাজসূয় যজ্ঞ" মতি রায় কৃত মূল্য দেড় টাকা। বিরক্ত হইয়া সরোজ নাটক লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তিন চারিখানা খাতা গাঁথিয়া সরোজ অনেক কবিতা লিখিল। গ্রন্থের নাম দিল "মুকুল"। ইহার কয়দিন পরে একখানা মাসিক পড়িতে 'মুকুল' নামে একখানা নব প্রকাশিত কবিতা বইয়ের সমালোচনা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। সরোজ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবে না—রাগ করিয়া কাব্যের নাম রাখিল 'অঙ্কুর'। সরোজের কবিতা রাশি ছাত্র মহলে নিতান্ত অনাদৃত হয় নাই। কিন্তু একদল ছাত্র সম্মুখে প্রশংসা করিলেও অন্তরালে তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিত। অন্যের নিন্দা উপেক্ষায় মন দিবার স্বভাব সরোজের ছিলনা। আপন প্রাণের ছন্দে আপনি বিভোর হইয়া সে লিখিত। অন্যের ভাল না লাগিলেও তাহা ত তার নিজের প্রাণের সত্যকার একটা অভিব্যক্তি।

সরোজের কবিতাগুলির আদর ছিল একজনের কাছে। তার নাম রমা। যে বাড়ীতে সরোজ থাকিত তারি পাশেই রমাদের বাড়ী। সরোজের প্রত্যেকটী কবিতা রমার বড় ভাল লাগিত। সরোজ কবিতা লিখিয়া তার একখানা কপি সকলের আগেই রমাকেই উপহার দিত। রমাকে না দেখান পর্য্যন্ত সে কোন কবিতাই অন্য কারো কাছে বাহির করিত না।

সে দিন সরোজ সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অভ্যাস মত ঘাটের এ ধার সে ধার ঘুরিতেছিল। ঘাটে সৌন্দর্য্যের হাট রমা—তাহার ছোট বোনের হাত ধরিয়া কলসী কক্ষে উপরে উঠিতে ছিল সম্মুখেই সরোজকে দেখিতে পাইয়া ঈষদ্ হর্ষ পুলকে একবার মাত্র তাহার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিল না।

রমা সরোজকে কি বলিতে যাইতেছিল, পেছন হইতে সুধামুখী বলিয়া উঠিল "কিরে রমা ভাবটা যেন ভাল লাগছে না, মরিস্‌নি ত?'

কথার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রমা মরমে মরিয়া গেল, রাগে ক্ষোভে তার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ঘাটের উপরে উঠিয়া সুধামুখী আবার বলিল, "ছোড়াটার মাঝে এমন কি দেখতে পেলি রমা। আমার মনে হয়

নিতান্ত পাগল। আমাদের হারু বল্‌ছিল ও হিজিবিজি কি সব লেখে। কবি নয় কপি।"

রমার বড় রাগ হইল, বলিল, "তুমি কি দেখলে সুধাদিদি যে আমায় যা ইচ্ছা তাই বলছ। মানুষের সঙ্গের কথা কইলেই দোষ।"

সুধা হটিবার পাত্রী নয়। সে অমনি বলিয়া উঠিল "কথা কইলে দোষ হবে কেন রমা! তবে ঐ চাওয়া চাওইটার ভিতর যেন কেমন একটু গোলমেলে দেখলুম তাই। তা রাগ করিস্‌নে ভাই, গরীবের ছেলে কিনা আর একটু পাগলা ছাটের।"

রমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "গরীবও মানুষ। তা সে গরীব হোক্ পাগল হোক্ তার সঙ্গে আমায় জড়াচ্ছ কেন সুধাদিদি! তোমার পায়ে পড়ি মেয়ে মানুষের ও যে বড় লজ্জার কথা—তার চেয়ে মরণও যে ভাল তুমি আমার মিথ্যে দুর্ণাম রটিও না।"

সুধামুখী হাসিয়া বলিল, "সে ভয় তোর নেই রমা, হাজার হলে ও আমি মেয়ে মানুষত!"

(২)

সরোজ ঘরে বসিয়া একটা প্রশ্নের অঙ্ক লইয়া বড়ই গোলমালে পড়িয়া গিয়াছিল, রমা কখন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে জানিতে পারে নাই। অনেক ক্ষণ রমা নিকটে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সরোজ এতই নিবিষ্ট যে পাশ ফিরিয়াও চাহিল না। অগত্যা রমা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে গেল। এবার সরোজ রমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "কে; রমা যে!"

রমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি মনে করেছিলুম আপনি ঘুমিয়ে স্বপ্নে অঙ্ক ক'সে যাচ্ছিলেন।"

সরোজ বক্র হাস্যে রমার দিকে চাহিয়া বলিল, "এ অঙ্কটা নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েগেছি কিছুতেই হয়ে উঠ্‌ছে না।"

রমা মধুর অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিল, "ও কবির কাজ নয় সরোজ বাবু। ঐ খানেই ত গোল, অঙ্ক কস্‌তেই মাথা গুলিয়ে যায় ওত আর সঙ্গীতের মত তরল নয় যে সাঁঝের বেলায় নদীর ধারে ধারে ঘাটের পাশে পাশে বেড়ালেই বেরিয়ে পড়বে!

সরোজ সশঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ও কথা বলছ কেন রমা?"

রমা উত্তর করিল, "তা পরে বলছি, অঙ্কটা আগে ক'সে নিন! পাটি-গণিতের অঙ্ক বুঝি! বলুন ত বাঙ্গলায় প্রশ্নটা বুঝিয়ে!"

সরোজ রমাকে প্রশ্নের বাঙ্গলা অর্থ বুঝাইয়া দিল। রমা শ্লেটখানা টানিয়া আবার প্রশ্নটা শুনিয়া লইল তার পর দাঁড়াইয়াই অঙ্কটা কসিয়া ফেলিল। বিস্মিত পুলকে সরোজ বলিল, "তোমার মাথাত বেশ পরিস্কার রমা, আমার মনে হ'ত তুমি আমারি মত শুধু কাব্যই বোঝ, এখন দেখছি গণিতেও তোমার বেশ অধিকার!"

রমা শ্লেটখানা সরোজের হাতে দিয়া বলিল, "সুখ্যাতি আর কর্‌তে হবে না। তা যাক্ যা বলতে এসেছি শুনুন, আপনি রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যান কেন?"

সভয়ে সরোজ বলিল, "সে কথাকি তোমায়ও বুঝিয়ে দিত হবে রমা?"

রমা অন্তদিকে চাহিয়া বলিল, "বুঝিয়ে না দিলে কি ক'রে বুঝব!"

সরোজ কণ্ঠস্বরকে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর করিয়া বলিল, "সূর্য্য যখন ডুবে যায়—চাঁদ যখন উঁকি মারে, পল্লীবালার কলসী ভরা সোহাগের জল যখন—বক্ষ লু'টে—"

রমা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর বলতে হবেনা সরোজ বাবু! তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস্ করছি,—কবিতার জন্ম রূপে না সৌন্দর্য্যে, প্রাণে না দেহে?"

সরোজ স্তব্ধবিস্ময়ে রমার মুখপানে তাকাইয়া রহিল এই পঞ্চদশবর্ষীয়া কুমারী অর্দ্ধশিক্ষিতা পল্লীবালা এত কথা শিখিল কোথায়? এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াত সরোজের ক্ষমতায় কুলাইবে না। শ্রদ্ধায় তার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠিল এমনি একটি সঙ্গীকে যদি সে চির জীবনের সহচরী করিয়া লইতে পারিত।

রমা আবার বলিল, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলেন কেন? কথার উত্তর দিন! কাব্যের দোহাই দিয়ে নিজের কু প্রবৃত্তিটা ঢেকে ফেলবার চেষ্টা সব যায়গায় খাট্‌বে কেন?"

সরোজ উত্তর করিল না। রমা বলিতে লাগিল, "লেখা পড়া শিখ্‌তে পরের বাড়ী এসেছেন, ও সব কেন? কাব্য শিখ্‌তে হয় ঘরে বসে ভাবুন আর লিখুন। কবি—হৃদয়ে কাব্য ফুটিয়ে তোল্‌বার অনেক জিনিষ ভগবান প্রকৃতির বুকে ঢেলে দিয়েছেন। মেয়ে মানুষের দিকে আড়ে আড়ে চাইলেই কাব্য ফুটে উঠে না!"

সরোজ এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি ও সব বুঝবে না রমা।"

রমা বাধা দিয়া বলিল, "আমি ও সব বুঝতে চাইনে সরোজবাবু! তবে আপনাকে নিষেধ ক'রে দিচ্ছি আর ও ধারে বেড়াতে যাবেন না। এটা আমার আদেশ বলেই জানবেন!"

সরোজের ভিতরটা তখন যেন কেমন ওলটপালট হইয়া যাইতেছিল। মুখটাও একটু গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল; সরোজ বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমায় নিষেধ বা আদেশ করবার কে রমা?" "আদেশ করবার: কে!" রমা ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "কেউ নই। আমার ভুল হয়েছিল সরোজবাবু, আমায় মাপ্ করবেন।"

রমা চলিয়া যাইতেছিল, সরোজ ডাকিল, "যেওনা রমা, আমি তোমার আদেশই মানলুম, তোমার নিষেধ বা আদেশ উপেক্ষা করবার ক্ষমতা যেন আমার নেই বলে মনে হচ্চে। কাল তুমি আমার জন্ত বড়ই অপ্রস্তুত হয়েছিলে রমা! তুমি আমার কাছে বিশেষ দরকার ছাড়া আর এস না।"

সরোজ মাসিক-পত্রিকা পড়িতে পারিত না। মাসিক হাতে করিলেই বা তার দুই এক পাতা উল্টাইলেই তাহার মনে হইত সেও উহার লেখক হইবে। সরোজ দেখিত প্রকৃতির কুঞ্জে কুঞ্জে কত সুরে কত পাখী গান ধরিয়াছে—সে ওদেরি মত কুঞ্জে বসিয়া গাহিতে চায়; কিন্তু পারে না। গাহিতে গেলেই একঘেয়ে একটা করুণ সুর তার সমস্ত গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সরোজ কখনও দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া লিখে—

ও বড় নিঠুর হাসি—
ছিঁড়ে যায় ওতে হৃদিবীণা তার,
ভেঙ্গে যায় বাঁশী বাজেনাকো আর,
অতি গোপনীয় মরমের তলে—
ঢালে বেদনার রাশি।
ও বড় নিঠুর হাসি!

এমনি করিয়া সরোজ তার কাব্য প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিতে যাইয়া নিজের অক্ষমতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িত। কয়দিন পরে সরোজ তাহার প্রতিবাসী—নরেশ চাটুর্য্যের এক পত্র পাইল। নরেশ লিখিয়াছে—

ভাই সরোজ!

বাবা আমার বিবাহ দিতেছেন। চারিদিক হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে!

রামনগরের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কাল তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন। তুমি হয়ত সে মেয়েকে দেখিয়াছ—দেখ্‌তে কেমন—তার সম্বন্ধে যতটা জান জানাইতে ত্রুটি করিও না, তার নামটাও লিখিও। খামে উত্তর দিও। ইতি।

তোমাদের নরেশ।

সরোজ বার বার পত্র খানা পড়িল, তারপর সেখানা তুলিয়া রাখিয়া অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিল। নরেশের পত্রের একটা জবাবত দিতে হইবে। কিন্তু কি সে লিখিবে—তার সমস্ত লেখনী তখন কবিতাময় হইয়া উঠিয়াছে—সরোজ লিখিতে বসে—কবিতা হইয়া পড়ে,—। তবুও সরোজ লিখিল।—নরেশ দা,

তোমার পত্র পাইয়াছি। যার কথা তুমি লিখিয়াছ সে আমার বিশেষ পরিচিত। আমি প্রথম যখন এখানে আসি তখন সে বালিকা—আমার কাছে মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়া নিত। এখন সে বড় হইয়াছে। আমি সুন্দর কুৎসিৎ বড় চিনিনা—তাই সে সুন্দরী কি না তোমাকে লিখিতে পারিলাম না। লোকে তাকে সুন্দরীই বলে। আমারও সুন্দরী বলেই মনে হইয়াছিল। লেখাপড়া বেশ জানে। তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলে বেশ হয়। তার নাম রমা ইতি—

তোমাদের

সরোজ।

বৈশাখের রৌদ্রপীড়িত প্রকৃতি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। সরোজ আপন শয্যায় শুইয়া একখানা বাঙ্গলা নভেল পড়িতেছিল। রমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'সরোজবাবু,"

সরোজ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল "কি মনে ক'রে রমা?"

রমা দরজার দিকে মুখ রাখিয়া বলিল, "কাল আমায় নিতে আস্‌বে।"

সরোজ জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঃ পরশু তোমার বিয়ে বুঝি! বিয়ে তা হলে সেখানেই হবে। তা নরেশ দা ত সে সম্বন্ধে আমায় কিছু লিখেনি।"

বাহিরে একজন ডাকপিয়ন ডাকিল, "সরোজবাবু, একখানা পত্র"। সরোজ বাহিরে আসিয়া পত্র হাতে লইল। গৃহে প্রবেশ করিলে রমা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে এল?"

সরোজ ঈষদ্ হাস্তে বলিল, "নরেশ দা তার বে'তে যোগ দিতে নেমন্তন্ন

করেছে। তা পরীক্ষার বছর স্কুল ফেলে ত আমি যেতে পারব না! একি রমা তোমার চোক দুটী ছল ছল ক'রে উঠ্‌ছে কেন?"

রমা সে কথার উত্তর না দিয়া পদ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে বলিল, "কাল আমি চ'লে যাচ্ছি—আমার বিয়ে—তাই।"

"তাই কি রমা? বলেই অমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছ কেন? এ বিয়েতে তুমি সুখী নও? নরেশ দা পাত্র ভাল। বেশ চেহারা, উদার অন্তঃকরণ,—সে তোমাকে সুখী করতে পারবে।"

"তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এলুম"।

"আমার কাছে বিদায় কেন রমা?" তারপর সরোজ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, "ও সব কিছু নয় রমা, দুদিন পরে দেখবে সেটা বাস্তব জগৎ, কল্পনার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তা আমার কাছে বিদায় চাচ্ছ কেন?"

"বিদায় চাচ্ছি কেন?" রমা আর বলিতে পারিল না। ঝর্ ঝর্ করিয়া চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সরোজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাও রমা, আমি হাসি মুখে তোমায় সংসারে প্রবেশ করতে অনুমতি দিচ্ছি। মনের কোণে গোপন পাপ পোষণ ক'রনা। তা হলে সংসারে সুখী হ'তে পারবে না। এ সব ছেলে বেলার স্বপ্ন। আশীর্ব্বাদ করি রমা, পতিসোহাগিনী হয়ে কোন দাগ যদি তোমার মনে বসে থাকে, তা যেন মুছে যায়; নরেশ দাকে স্বামী পেয়ে তুমি যেন সুখী হও। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—সীতা সাবিত্রীর চরিত্র আদর্শ করে সংসার সুখের ক'রে তোল।

বলিতে বলিতে সরোজ অন্যদিকে চাহিল। রমা সরোজের পায়ে মাথা নোয়াইয়া ধীরে ধীরে নতমুখে বাহির হইয়া আসিল। সরোজ ডাকিয়া বলিল, "নরেশ দাকে ব'ল রমা ছুটী নেই ব'লে যেতে পারলুম না।"

৩

উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছাটা বরাবরই সরোজের ছিল। তাই সে নিজের দারিদ্র্য উপেক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিঁড়িটা পার হইবার পর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া একেবারে কলিকাতা চলিয়া আসিল। তার দূরসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। তার সেই আত্মীয়টী

সামান্য বেতনে চাকুরী করিতেন—সরোজের খরচ বহাটা তার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তাই একদিন তিনি সরোজকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "জানত সরোজ, আমার সামান্য মাইনা, তুমি, এক'টা টিউসনি দেখ।"

আত্মীয়ের কথায় সরোজ চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। একেত সে এই বিশাল সহরের মধ্যে আসিয়া নিজের অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে তার উপর কোথায় সে কি করিয়া টিউসনির খোঁজ করিবে। অবস্থার সঙ্গে অনেকদিন লড়াই করা চলে না; ক্রমশঃ সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। এত দিনে তার কাব্যরস একেবারে শুষ্ক হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন দিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া সে প্রাণের মাঝে গানের সুর শুনিতে পাইত। তাহাও ক্ষণিক, নিবিড় কৃষ্ণমেঘে চপলার ক্ষণিক হাসিটীর মত। ষ্ট্যাণ্ডরোডের দীপ-মালা গঙ্গার জলে প্রতিফলিত হইয়া যখন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, সরোজ মনে মনে কল্পনা করে, আজ একটা কবিতা লিখিবে। কিন্তু বাসায় ফিরিবার পথে সে ভাবরাশি শূন্যে মিলাইয়া যায়। যে দুই চারিটী রূপসীর পলকের দর্শনের নিমিত্ত সে রামনগরের নদীতীরে ঘুরিয়া বেড়াইত আজ শত শত সুন্দরীর রূপচ্ছটা তাহার কবিতার রুদ্ধ অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে না। সরোজ আপাততঃ কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিল।

কয়দিন পরেশনাথের বাগানে বেড়াইতে যাইয়া সরোজ বুঝিয়াছিল—এটা বেশ বেড়াবার যায়গা। তাই প্রতিদিন সে সেইখানেই বেড়াইতে যাইত। কত লোক মন্দির দেখিতে আসে, কত ইংরেজ, পার্শি, ইহুদী—হিন্দুস্থানী—মাদ্রাজী—কতদেশীয় লোক। সরোজ দেখিত, সবচেয়ে দরিদ্র এই বাঙ্গালীর জাত। জীর্ণ-শীর্ণ, দুর্ব্বলদেহ—স্থূল হইলেও শক্তিহীন। কয় মাস রাস্তায় বেড়াইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে এই বাঙ্গালার সহরে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার বাঙ্গালীর বড় বেশী কিছু নাই। বাঙ্গালী যেন প্রবাসী। সরোজ তখন মানসচক্ষে দেখিতে পাইত—বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী—পেটে অন্ন নাই, রোগে ঔষধ নাই—প্রাণে উৎসাহ নাই, দেহে সামর্থ্য নাই। আছে কেবল পরদাসত্ব—পরস্পর হিংসা আর জীবনভরা আলস্য। ঐ যে পাশ্চাত্য-জাতিরা মোটর হাকাইয়া রাস্তায় চলে বাঙ্গালী ভয়ে ভয়ে দশ হাত দূর দিয়া সরিয়া যায়। সরোজ দেশ হইতে শুনিয়াছিল সেখানে সাদায় কালায় মেশা-মেশি—কিন্তু তার নিকট সেটা এতই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল যে সে কল্পনা করিয়াও এত পার্থক্য অনুভব করে নাই।

একদিন পরেশনাথের বাগানে তিনজন সাহেব মেম বেড়াইতে আসিয়াছিল। সরোজ দেখিল, মন্দিরের একটি চাকর স্বহস্তে তাহাদের চর্ম্ম-পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া এক প্রকার কাপড়ের জুতা পরাইয়া দিল। মন্দির দেখিয়া নীচে নামিলে আবার জুতা পরাইয়া দিয়া সেলাম করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি দুই আনি বক্‌শিস করিল। সরোজের তখন মনে হইল, হায়রে দেশের অধঃপতন! সামান্য কয়টা পয়সার লোভে এতটা নীচ কাজ করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না। তাহার প্রাণের তার অমনি অগ্নস্বরে বাজিয়া উঠিল—এই অধঃপতিত ছোট লোকদিগকে জাগাইতে হইবে ইহাদিগকে নিজের আত্মসম্মান বুঝাইয়া দিতে হইবে নহিলে দেশের মঙ্গল নাই। সে যখন কবি বলিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে তখন এমন গান সে গাহিবে যে দেশের লোক সে ছন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে। কবির সেই সুরটি অমনি কাণে বাজিয়া উঠিল। "আমরা ঘুচাব মা তোর দুঃখ, মানুষ আমরা নহি, মেষ"! চলিতে চলিতে সরোজের মন তখন দারুণ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাস তার প্রাণকে নব জাগরণের সাড়ায় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, সরোজ গুণ গুণ করিয়া গাহিল—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।"

সরোজ বাহ্যজগৎ ভুলিয়া গেল, জন্মভূমির আকুল আহ্বান সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল দেশবাসীর কাতর আর্ত্তনাদ তাহাকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিল চারিধারে একটা বিরাট অন্ধকার—একটা প্রাণহীন নির্জ্জীবতা সমস্ত বাঙ্গলার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সরোজ এর বিরুদ্ধে মাথাখাড়া করিয়া দাঁড়াইবে।

বাসায় ফিরিলে সরোজের আত্মীয়টী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিহে সরোজ টিউসানি পেলে?'

এক কালে সরোজের সমস্ত সংকল্প জল হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে সরোজ বলিল, "আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজইত পেলুম না! কাল থেকে একবার প্রাণপণ চেষ্টায় খুঁজে দেখব!"

সমস্ত রাত্রি সরোজের নিদ্রা হইল না। একদিকে নিপীড়িত অশিক্ষিত দুঃস্থ সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা অন্যদিকে দারিদ্র্যের ভৈরব গর্জ্জন। সরোজ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল এ দরিদ্র দেশের কিছু হবে না। এই অর্থ সমস্যার যুগে জাতির দারিদ্র্যই তাহাকে খঞ্জ করিয়া রাখিয়াছে। ধীরে ধীরে সরোজের হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল।

কলেজ শেষে সরোজ বাসায় ফিরিতেছিল, নিরাশার বিপুল আঁধার একে একে তাহার সমস্ত আলোক নিভাইয়া দিতেছিল, সরোজ দেখিতেছিল দৈন্য তার ভৈরব বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে যে দিকে চায় সেই দিকেই শুধু অভাবের প্রেতমূর্ত্তি।

একখানি প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সরোজ দেখিল বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা "গৃহশিক্ষক আবশ্যক বেতন যোগ্যতা অনুসারে। বাঙ্গলা ভাষায় যিনি সুপণ্ডিত কাব্যে যার অধিকার আছে, তিনিই শুধু দরখাস্ত করিবেন।" সরোজের সারা হৃদয় পুলকস্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল এত দিনে তাহার কাতর প্রার্থনা ভগবানের সিংহাসন তলে পৌছিয়াছে। সরোজ গৃহকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে গৃহকর্ত্তা বলিলেন, "দরকার ত বটে, তা আপনি পারবেন কেন, আপনি ও দেখছি কলেজের ছাত্র, বয়স ও খুব বেশী নয় একটী মেয়েকে পড়াতে হবে থার্ড ক্লাসে পড়ে তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের আমি বড় পক্ষপাতী তাই বাঙ্গলা ভাষাটাই ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে। মেয়েরও একটু বয়স হয়েচে তা আপনাদের মত ছেলে ছোক্‌রা দিয়ে পড়ান চলে না।"

সরোজের মুখ মলিন হইয়া গেল, ম্লান মুখে সরোজ বলিল, এতে আমার বল্‌বার আর কি থাকৃতে পারে! সন্দেহের কোন কারণ না থাক্‌লেও তা আপনি মান্‌তে চাইবেন কেন? তবে আমি বড় গরীব; পেলে আমার পড়াটা চলত, বাধ্য হয়ে আমায় পড়া ছেড়ে দিতে হচ্ছে!"

সরোজ নমস্কার করিয়া ফিরিতেছিল, গৃহ কর্ত্তা বলিলেন, "দাঁড়ান, আচ্ছা আপনি ভাল কবিতা লিখতে পারেন? লিখুন ত যা আপনার খুসী দুই চারি লাইন। সরোজ কলম লইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ছোট কবিতা লিখিয়া ফেলিল। কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইয়া চাকরকে বলিলেন, "নীহারকে পাঠিয়ে দেত, তার এক মাষ্টার এসেছে!" তার পর সরোজকে একেএকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এই ত চাই দুঃখের সঙ্গে না লড়লে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কেন?

(৪)

সরোজ তাহার ছাত্রীটাকে লইয়া প্রথম প্রথম বড়ই বিপদে পড়িয়া গেল। একে বড় লোকের আদরিণী কন্যা তাহাতে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িয়া একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন। পারা গাঁয়ের ছেলে সরোজের কাছে এটা কেমন যেন

অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। তার পর নীহার নিতান্ত বালিকা নয়। নীহার তার মাষ্টারটাকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে না দেখিলেও কখনও অশ্রদ্ধা করিত না। সে যখন তার মাষ্টারটীর সম্যক পরিচয় পাইল, তখন প্রায়ই সে তাহার নিজের খাবারের পয়সা গুলি তাহার মাষ্টারের পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলিত "মাষ্টার মশায় আজ একটু বেশী পরিশ্রম কর্‌লেন জল খাবেন।"

সরোজ দান গ্রহণে নিতান্ত অনভ্যস্ত না হইলেও ইদানীং পরের দান গ্রহণটা সে হেয় কাজ বলিয়া মনে করিত। তাই নীহারের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া সঙ্কুচিতচিত্তে পয়সা লইয়া আপনাকে ঋণী মনে করিত। একদিন সরোজের বড় সন্দেহ হইল, পয়সা গ্রহণের কালে সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "নীহার, মাঝে মাঝে তুমি আমায় খাবারের পয়সা দাও—কোথায় পাও তুমি।"

নীহার মৃদু হাস্যে উত্তর করিল, তা দিয়ে আপনার দরকার কি মাষ্টার মশাই?"

সরোজ জেদ করিয়া বলিল,

"তা না বল্‌লে আমি নেব না নীহার!"

নীহার বিপদে পড়িয়া বলিল, "বাবা রোজ রোজ আমায় চার আনা করে জল খাবার দেন, খাওয়ার দরকার আমার বড় হয় না।"

সরোজ বিস্ফারিত চক্ষে নীহারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার খাবারের পয়সা না খেয়ে আমায় দাও কেন?"

নীহার তাহার সকরুণ বিশাল চক্ষু আয়ত করি৷ বলিল, "আপনি গরীব, পয়সা কোথায় পাবেন? পড়াতে আপনার বড্ড পরিশ্রম হয়।"

অপমানে সরোজের সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—কাতর স্বরে বলিল, "গরীব ব'লে দাও নীহার! আমি গরীর বটে ভিক্ষুক নই যে তোমার ভিক্ষা নেব। গরীবের একটা আত্ম সম্মান আছে—তোমরা কি তাদের এতই ছোট এতই অপদার্থ মনে কর।"

নীহার অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা কেন মাষ্টার মশাই ভিক্ষা হবে কেন? আপনিত চান্ না।"

সরোজের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তীব্র অপমান বুকে চাপিয়া সরোজ বলিল, "চেয়েই হ'ক আর না চেয়েই হ'ক দান নেওয়া মানুষের কাজ নয় নীহার! মানুষ নিজের ক্ষমতায় খে'টে খাবে, পরের দ্বারে ভিখারী হবে

কেন? পরের অন্নে আমি অনেক দিন প্রতি পালিত হয়েচি, তা'তে কত নীচতা তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, আর না।"

সরোজ ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া আসিতেছিল, নীহার মাষ্টার মহাশয়ের হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল, "মিছে কথা কয়েছি মাষ্টার মশাই, গরীব বলে দিইনি, কেন যেন দিতে ইচ্ছে হয় তাই দিই।"

নীহার নিজের পড়া নিজেই করিয়া লইত। সরোজ কেবল ঘণ্টা দুই সাক্ষি গোপালের মত বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিত। তবে সরোজের পরিশ্রম হইত সেই দিন যে দিন নীহার কাব্য শিখিবার জন্য খাতা লইয়া বসিয়া যাইত। সরোজ নীহারকে শিক্ষা দিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি কবিতার বই পড়িতে উপদেশ দিত।

নূতন নূতন ছন্দের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সরোজ বলিল, "ওসব কেন নীহার, ক্লাসের পড়া কর। এত অল্প বয়সে কবিতার দিকে অতটা ঝোক্ দিলে লেখা পড়া বড় কিছু হবে না।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল, "শ্রান্ত হয়েছেন মাষ্টারমশাই তাই বলুন না। ক্লাসের পড়ার জন্য আমার মাষ্টারের দরকার নেই। বলুন দেখি ক'দিন আমায় ক্লাসের পড়া বলে দিয়েছেন। কাব্য শিখাবার জন্যই আমার মাষ্টার রাখা।"

সরোজ আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া বলিল, "কাব্যত শিখান যায়না নীহার কাব্যটা ভিতরকার জিনিষ-প্রাণের সঙ্গীত।"

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে নীহার তাহার মাষ্টারের দিকে চাহিয়া রহিল! সরোজ বলিতে লাগিল, "বিস্মিত হয়োনা নীহার এটা সত্যি কথা। কাব্যশক্তি ঈশ্বর-দত্ত। অনুশীলন দ্বারা মানুষ তা বাড়াতে পারে মাত্র। তবে সে শক্তি অল্প বিস্তর সবার ভিতরেই আছে। যার তা প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা আছে সেই কবি।"

নীহার জিজ্ঞাসুর স্বরে বলিল, "কি ক'রে প্রাণের কথা কলমে বের হয়ে পড়ে মাষ্টার মশাই?"

সরোজ উত্তর করিল, "তা জেনে কাজ নেই নীহার! কবির জীবন বড় দুঃখের। তবে কবি আপনার সুখে আপনি বিভোর। বিশ্বের সমস্ত দ্বার কবির কাছে মুক্ত—কবিতাই সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র। সারাবিশ্বটা কবির সংসার—বিশ্বের পরিবার তার আপন ব'লে, তার এত দুঃখ। কেন, আর এক দিন তোমায় বুঝিয়ে দিব।"

সরোজ তাহার কবিতার খাতা নীহারকে পড়িতে দিয়াছিল। পড়িয়া

নীহার বলিল, আপনার কবিতা গুলি, কেমন যেন একঘেয়ে—যেন কত বিষাদ-ইংরেজীতে যাকে melancholia বলে।"

সরোজ নীরব রহিল, নীহার বলিতে লাগিল, "এত দুঃখকি আপনার মাষ্টার মশাই যে কবিতাকে এমন দুঃখময় করে তুলেছেন। সে যাক্ এ সবত দেখ্ছি আপনার ছোটবেলাকার লেখা—এখন লিখ্‌ছেন না কেন?"

সরোজ উত্তর করিল, "কি লিখব নীহার! কলমে লেখা ফোটে না। আমি কবিও নই! তারপর কাব্য নিয়ে থাকার এ যুগ নয়। কাব্যে ভাব ফুটিয়ে তুললে দেশের দুর্গতি ঘুচবে না। এটা কর্ম্মযুগ। এ যুগে যে জাতির মধ্যে কর্ম্মীর সংখ্যা যত বেশী হবে সে জাতির ততই মঙ্গল। দেখছ না পাশ্চাত্য জাতির দিকে চেয়ে কত বড় তারা! তারা কর্ম্মী তাই ভাবুক ভারতবাসীর উপর প্রভুত্ব করছে। তারা কাব্যের চেয়ে বিজ্ঞানের আমল দিয়েছে উপরে—তাই তারা প্রভু, আমরা ভৃত্য। এই ভাবের ঘোরে কল্পনার আশ্রয় করে আমরা সব খোয়াতে বসেছি। বাঙ্গলার চারিধারে হাহাকার জরা ব্যাধি অকাল মৃত্যু কত কি! কাব্য নিয়ে থাকলে আর চলে কি! আগে দেশের অভাব দূর করতে হবে দেশকে বাঁচাতে হবে।"

নীহার অবিশ্বাসের সুরে বলিল, "কি সব বকে যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই, কোথায় রোগ শোক হাহাকার, কবি কিনা!

সরোজ বলিল, "এ কাব্যের শব্দযোজনা নয় নীহার, অতি বড় সত্য কথা। চিরদিন সহরে আছ—মারহাট্টা ডিচের ওধারেও বোধ হয় যাও নি, আমি বলছি বাঙ্গলার পল্লীর কথা। পল্লী দিন দিন জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মে ঐশ্বর্য্যের ছায়ায় বেড়ে উঠেছ, তুমি দেশের কথা কি বুঝবে?"

এই অনভিজ্ঞতাটা নীহারের কাছে প্রকাণ্ড একটা দোষ বলিয়া মনে হইল। দেশের দুর্দ্দশার কথায় তাহার কোমল নারীহৃদয়ে বড় ব্যথা অনুভব করিল। করুণ-কণ্ঠে নীহার বলিল, "সত্যি মাষ্টার মশায় এত দুঃখ এদেশের!"

সরোজের স্বর ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হইতেছিল। সরোজ বলিতে লাগিল, "তাই বলছিলুম নীহার কবি হওয়ার অনেক দুঃখ। এবার কবিকে কল্পনা ছেড়ে কাজ দেখতে হবে। হাঁ, কবিরও যে মোটে দরকার নেই তা নয়—এমন কবি হ'তে হবে যে কবির গানে দেশ মেতে উঠে, এমন কবিতা লিখতে হবে যার প্রতি ঝঙ্কারে মানুষ সৃষ্ট হয়, নির্জ্জীব বাঙ্গালী আবার সজীব হয়ে উঠে। তেমন

গান গাইতে হবে যে গান চাঁদ কবি দিল্লীর রাজসভায় গান করেছিলেন। চারণ কবিদের মত চারণ সাজতে হবে তেমন চারণ—ইতিহাস পড়েছ যারা গান গেয়ে বাপ্পা কুলতিলক হামীরকে চিতোরোদ্ধারে সহায়তা করেছিল—যাদের গানে উন্মত্ত হয়ে রাজপুতবালা প্রিয়তম স্বামীপুত্রকে দেশের মঙ্গলে মৃত্যুমুখে তুলে দিত নিজেরাও আগুনে ঝাপিয়ে পড়তে ভয় পেত না। যদি পারি তেমন কবি হব নইলে আর কবিতা লিখব না। শুধু প্রেমের গানে দেশের দুর্ব্বলতা বাড়ছে বই কম্‌ছে না নীহার!"

সরোজের কথায় নীহার বহুক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার ছোট্ট মাষ্টারটী যাহাকে সে নিতান্ত গরীব ১৫৲ টাকা বেতনভোগী বড় বেশী কিছু মনে করিতে পারিত না, আজ যেন কেন তার মাথাটা আপনা হইতেই তারি পায়ে নত হইয়া আসিল। নীহার বুঝিল—এই অপদার্থ গরীব বেচারী একটা প্রকৃত মনুষ! প্রীতিতে তার সারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন যেন আজ মাষ্টার মহাশয়ের নিকটে দাঁড়াইতে তার ভারী লজ্জা হইতে লাগিল, দুইবৎসর সে ইহার কাছে পড়িতেছে এমন ভাবটী সে কোনদিন উপলব্ধি করে নাই। নতমুখে নীহার বলিল, "আমরা এতে আর কি কর্‌ব মাষ্টার মশাই দেশের কাজ ত পুরুষেরাই কর্‌বে!"

সরোজ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"তোমরা কি কর্‌বে! পড়নি নীহার—

"সুকেশিনী শিরঃ শোভা কেশেরচ্ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে যদি তাহে হয় উপকার।"

এ ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের সাহায্য কর্‌বে! নইলে হবে না। নারী পুরুষের শক্তি, সেই শক্তির সহায়ে তারা শক্তিমান্ হয়ে উঠবে, তাদের উৎসাহে পুরুষের ক্লান্ত দেহে আবার নূতন উৎসাহ জেগে উঠবে।"

নীহার এক অপূর্ব্ব মধুর হাস্তে বলিল, "যান—আপনিও যেমন! কবি কিনা কেবল কথায় কথায় কাব্য।"

অমন মধুর হাস্ত নীহারের মুখে সরোজ আর কখনো দেখে নাই! আজ বহু দিন পরে তাহার রমার কথা মনে হইল। সেও একদিন এমনি মধুর হাস্তে তার একটী কথার প্রতিবাদ করিয়াছিল।

সরোজকে নীরব দেখিয়া নীহার বলিল, "যান মাষ্টার মশাই অনেক রাত হ'য়ে গেল, এই নিন আজ জল খাবেন। আপনাকে দান কর্‌ছিনা এতটা বক্তৃতা কর্‌লেন এটা তারি মুজুরী।"

সরোজের হাতে শিকিটা তুলিয়া দিয়া হাসি লুকাইয়া নীহার দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

(৫)

সহরের বাতাসে সরোজের পারা গেঁয়ে ভাব ছুটিয়া গিয়াছিল। প্রতিবারেই গ্রামে আসিয়া সে একটা বিশেষত্ব অনুভব করিত। সব চেয়ে পার্থক্য তার কাছে ঠেকিত যে দেশের ভদ্রলোকের সাধারণকে মানুষ বলিয়াই মনে করে না। গোড়ামীটা তার কাছে বড়ই বিসদৃশ বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। সরোজ এতদিন দেশের কথা চিন্তা করিয়া যতটা বুঝিয়াছে, তাহাতে কেবলি তাহার মনে হইত—যতদিন দেশের আপামর সাধারণ একযোগে কাজ করিতে না শিখে তত দিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা কোন কাজই হইবে না। তাই সরোজ সেবার গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী যাইয়া আবদুল্লা পুরের মুসলমান পারায় এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছে। সভাভঙ্গে উক্তগ্রামের ছলিম মোল্লা বলিল, 'দেখুন বাবু, আমরা মোছলমান চাষা লোক লেখাপড়া শিখে কি করব।' উত্তরে সরোজ বলিয়াছিল "মোল্লা সাহেব কৃষকের কি আর লেখাপড়া শেখার কিছু নেই! বিলাতে চাষারাও লেখা পড়া জানে। কৃষিবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে—সে বিদ্যা শিখলে জমীতে একমনের স্থলে দুই মন ফসল জন্মাবার উপায় জানা যায়। আমাদের দেশের চাষারা একবৎসর বৃষ্টি না হ'লে চোখে আঁধার দেখে ইউরোপে তারা কত কি উপায়ে বৃষ্টির কাজ সেরে নেয়। লেখাপড়া না জানলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। আপনাকে একখানা ঘর ছেড়ে দিতে হবে তাতে স্কুল বসবে। দিনে ছেলেরা পড়বে, রাত্রে সকলেই পড়বে। মুষ্টি চাল তুলে শিক্ষকের মাইনে চালাতে হবে।" আবদুল্লাপুরের মুসলমানগণ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল। ছুটীতে ছুটীতে বাড়ী আসিয়া সরোজ স্কুল পরিদর্শন করিত। এইরূপে সে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বা পল্লীতে ও অল্পবিস্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল অল্পদিনের মধ্যেই সরোজ বিশেষ প্রতিপত্তি শালী হইয়া উঠিল।

একদিন নরেশ সরোজকে বলিল, "কি হে সরোজ! এ সব হচ্ছে কি ছোট লোকদিগকে এমন ক'রে মাতিয়ে তুললে, ভদ্রলোকের সম্মান থাকবে ত?"

সরোজ আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিল, "তুমি এ কথা বলছ নরেশ দা! যে তুমি

রমার স্বামী! সে কি তোমায় এই শিক্ষা দিয়েছে! নরেশ দা একবার দেশটার দিকে চেয়ে দেখ ত,—কি দুর্দ্দশা দেশের।—লেখাপড়া শিখে তোমার এই জ্ঞান হলো? কি তোমার আভিজাত্য যে তুমি তার এত গৌরব করছ? সাধারণ যদি না জাগে একবার সহরে যেয়ে দেখ কত ছোট তোমরা অন্যের কাছে।"

নরেশ মাথা হেট করিয়া চলিয়া গেল। পূজার ছুটী ফুরাইয়া আসিতেছিল নীহার পত্র দিয়াছে।—"মাষ্টার মহাশয় শীঘ্র আসুন। আপনার উপযুক্ত কাজ জুটিয়াছে। সহরের এ কোয়াটারে বড় কলেরা লাগিয়াছে। এবার কাজের কাজ করিবার বড় সুযোগ একদল স্বেচ্ছাসেবক কাজে লাগিয়াছে। বাবা একা আমায় রোগী সেবায় যেতে দেন না।" সরোজ যাইতেছি বলিয়া উত্তর লিখিয়া তাড়াতাড়ি কাজ গুছাইতে লাগিল।

সরোজ কলিকাতা পৌছিয়া দেখিল নীহারের মায়ের কলেরা—সরোজ দিবারাত্রি রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সারিয়া উঠিয়া তিনি সরোজকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সরোজ স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম রেজেষ্টারী করিয়াছিল। তার কয় দিন পরে নীহারের নিজের কলেরা হইল, সরোজ আহার নিদ্রা ভুলিয়া রোগিণীর কাছে বসিয়া থাকিত। নীহার কখনো ক্ষীণ স্বরে বলিত, মাষ্টার মশাই আমি মরব না, আপনি শরীরের উপর অত্যাচার করে এমন না খেয়ে দেয়ে বসে থাকবেন না। শুধু আমার কাছে বসে থাকেন কেন? আরও যে পাড়ায় কত রোগী।—"

কর্ত্তব্য ত্রুটির ভয়ে সরোজ অন্যান্য রোগী সেবায় ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিত না। নীহার বাঁচিয়া উঠিল—তার মাষ্টার মহাশয়ের জন্য অমূল্য একটা পুরস্কার লইয়া।

একদিন সরোজ নীহারদের বাড়ীর দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া জন-সমাগম দেখিতেছিল। কতকগুলি পশ্চিমদেশীয় মুজুর দল বাঁধিয়া রাস্তার একধারে কি একটা কাজ লইয়া গোলমাল করিতেছিল। এমন সময়ে একজন সাহেব মোটর হাঁকাইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেই এক ব্যক্তি চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। সাহেব মোটর থামাইয়া চাবুক হস্তে সেই ব্যক্তিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বেচারী প্রাণের ভয়ে দলের মধ্যে লুকাইল। এ অবিচার সরোজের সহ্য হইল না। একে ত মোটর চালক সাবধানসূচক বংশীধ্বনী করে;

নাই—তার উপর চাবুক মারিতে যায়! সরোজ জামার হাতা গুটাইয়া নীচে নামিতেছিল।

নীহার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল "কোথায় যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই!"

সরোজ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল "ছেড়ে দাও—নীহার, বেটার চাবুক মারা দেখিয়ে দি। লোকটা চাপাও পড়ছিল ওর দোষে আবার চাবুক খাবে।"

নীহার সরোজকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, "অত মাথা গরম করলে কাজ হবে না মাষ্টার মশাই। সব সইতে হবে। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দ্দার! ফল হবে শ্রীঘর বাস!"

সরোজ হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, "শ্রীঘরের ভয় করিনে নীহার!"

নীহার আরও জোরে হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমিত করি। আর মিছিমিছি কে জেলে যায়! এসব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা একা করলে কি হবে! দেশের লোক ঘুমুচ্ছে তাদের জাগান। মার খান আরও পিঠ পেতে দিন। ভগবানের পিঠে এমার একদিন যেয়ে লাগবেই। অত্যাচার করবেন ত মরণ!"

সরোজ অবাক্ বিস্ময়ে নীহারের দিকে চাহিল—নীহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গ্রীষ্মের ছুটীতে সরোজ এক নূতন মানুষ হইয়া বাড়ী গেল। সরোজের ইচ্ছা আর পড়িবে না, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। কাজেও সরোজ তাহাই করিল—কলেজ খোলার পরেও কলিকাতায় গেল না, গ্রামে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিল।

রমা যখন শুনিল সরোজ আর পড়িবে না তখন সে একদিন দুপুর বেলায় সরোজদের বাড়ী আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—বিবাহের পর দীর্ঘ দিন পরে রমার সঙ্গে সরোজের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

সরোজ রমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল, "রমা" নাকি—না নাম ধরে ডাকলে আর পোষায় না—এখন ছেলের মা হয়েছ—তা বৌদি বলেই ডাকব। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কেন রমা!"

রমা মুখের ঘোমটা সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "পড়াটা ছেড়ে দেবার মানে কি? এইত ফোর্থ-ইহার!"

সরোজ পাশের ঘরে চৌকিতে রমাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "প'ড়ে আর কি হবে—এসব ছাই—পড়ায় বিদ্যা বড় কিছু হয় না। তারপর আমি মনে করেছি এখন থেকে দেশের কাজে লাগ্‌ব।"

রমা চৌকিতে বসিয়া বলিল, "দেশের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া সকলের সাজে না। যাদের খাওয়া পরায় ভাবনা নেই তারাই ও সব করুক্। বাড়ীর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখলে ভাল হয় যে কি ক'রে সংসার চল্‌ছে।"

"ও সব ভাবতে গেলে আর চলে না রমা! সংসারের ভাবনা ভেবে' কেউ কোনদিন কোন কাজ কর্‌তে পারেনি। জান রমা—একবার মার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে আসে ক্ষুদ্র একটা পরিবারের ভাবনা আর তাকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। শঙ্করাচার্য্য শ্রীচৈতন্য এরা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিজের আত্মীয় স্বজনের দিকে তাকাননি। আমরা তাঁদের পায়ের ধূলার যোগ্যও নই তাই অত সাহস করি না। আমার ছোট পরিবার একভাবে চল্‌বেই।"

"বে' থা কর্‌তে হবে না?"

"সে সাধ অনেক দিন, যেদিন তোমাকে"—সরোজ কি বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। পরে বলিল, "বিয়ে আমি করব না। ওটা একটা প্রতিবন্ধক। শত সহস্র যুবকের আত্ম-বলি নইলে দেশের মঙ্গল নেই রমা।"

রমা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "দেশের কাজ কর্‌তে কেউ কাকে নিষেধ কস্‌তে আসেনি। আমি বল্‌ছি পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে।"

সরোজের হাসি পাইল। আজও রমা তার কাছে তেমনি দাবী রাখে। হাসিয়া সরোজ বলিল, "আজও যে তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নিব তা কি ক'রে জান্‌লে রমা? আদেশটা এখন নরেশ দাকে কর্‌লেই ভাল হয় রমা! কিন্তু বড় দুঃখ হচ্ছে যে দেশের কান্না তুমি শোননি!"

রমা সরোজের কথার কোন জবাব না দিয়া চলিয়া আসিল। ইহার দুই দিন পরে সরোজ কলিকাতা রওনা হইল।

এবার নীহার বলিল, "এত দেরী যে মাষ্টার মশাই চিঠির পর চিঠি লিখেও জবাব পেলুম না। আপনার দেরী দেখে বাবা আপনার আশা পর্য্যন্ত একজন নূতন মাষ্টার রাখ্‌তে চাইলেন। আমি স্বীকার কর্‌লুম না।"

সরোজ ম্লান মুখে বলিল, "বেশ তাই রাখ! আমি আর কতদিন পড়াব। ইচ্ছা ছিল আর পড়ব না। তা পড়তেই হবে। বিয়ে পাশ না কর্‌লে ত

৩০৲ টাকার সাধের কেরাণী গিরি জুটবে না! তাই সংসারে যে আমার বড় আপন বলে মনে মনে গর্ব্ব করে সে বি, এ টা পাশ কর্‌তে আদেশ দিয়েছে।"

নীহার মৃদু হাস্তে বলিল, "কে এত বড় আপন মাষ্টার মশাই! আমি ত বলিনি।" নীহার অলক্ষ্যে জিভ কাটিল, পরে আবার বলিল, "ঠিক কথা, পড়া ছাড়বেন কেন! আর আমি মাষ্টার ছেড়ে দিব কেন! চাকরী কর্‌তে চান বাবাকে বলে একটা জুটিয়ে দিব, অনেক সাহেবের সঙ্গে বাবার আলাপ! আর একটা মজার কথা মাষ্টার মশাই, আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল!"

সরোজ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে নীহারের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "বেশত নিমন্ত্রণ খাওয়া যেত। "মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ।"

নীহার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা আর হচ্ছে না। এবারকার খাওয়াটা বুঝি থেকে যায় মাষ্টার মশায়! ওকি চম্‌কে উঠলেন যে! আমি বে কর্‌তে অস্বীকার করেছি!"

সরোজের মনে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িল, সে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি নীহার!" নীহারের মৃদু-হাস্য অধরে মিলাইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া নীহার বলিল, "কেন মাষ্টার মশাই আপনি না বলেছেন বে কর্‌লে দেশের কাজ করা চলে না। তাই আপনিও বে' কর্‌বেন না।"

সরোজ উত্তর করিল, "আমার বিষয়ে যা খাটে, তোমার বিষয়ে তা খাটে না নীহার—আমি পুরুষ, তুমি স্ত্রীলোক—আমি দরিদ্রের সন্তান, তুমি ধনীর কন্যা। হিন্দুর ঘরে চিরকুমারের অভাব নেই, চিরকুমারী বড় দেখা যায় না। তুমি বে কর নীহার—অবস্থাপন্ন সৎপাত্র দেখে। স্বামীর অর্থ দেশের কাজে ব্যয় কর্‌তে তাকে উদ্বোধিত ক'রো। প্রাণ আর অর্থ থাকলে বড় বড় কাজ করা যায় নীহার। দরিদ্রের চেষ্টায় কোন কাজ হয় না। হিন্দু—ব্রাহ্মণের মেয়ে তুমি বাপ মায়ের অবাধ্য হয়ে হিন্দুর আদর্শকে কলঙ্কিত ক'র না।"

নীহার অধর দংশন করিয়া বলিল, "অবাধ্য মেয়ে আমি নই মাষ্টারমশাই! শিক্ষিতা বয়স্থা হিন্দুবালার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌বার অধিকার হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ লোপ করেন্ নি। ইংরেজী নভেল্ পড়ে আমার মাথা গরম হ'য়ে যায় নি। আমি ভালমন্দ বুঝবার আগে বাপ মা যদি আমায় যার তার হাতে তুলে দিতেন মন্দ হলেও তা আমি মান্‌তে বাধ্য হতুম। যাক মেয়ে মানুষের ধর্ম্ম মেয়েরাই ভাল বোঝে এ সম্বন্ধে আপনার উপদেশ আমি চাইনে!

(৬)

পরীক্ষার পর সরোজ বাড়ী আসিল।—বঙ্গ ভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের ধুমটা তখন পুরা দমে চলিতেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনকারিগণের সঙ্গে মৌলিক সূত্রে তাহার মিল না থাকায় সে কাজে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। নরেশ এবার সুযোগ পাইয়া বলিল, "কি হে সরোজ এত ধুম ধামেও তুমি যে চুপ!"

সরোজ উত্তর করিল; "পাছে পাছে আস্‌ছি নরেশ দা! তবে তোমরা যে পথটা ধরেছ সে পথে আমি যেতে চাইনে। দেশের বারো আনা লোককে ফেলে রেখে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার্‌বে না।"

তারপর সরোজ তাহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান ভাইদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি করিতে লাগিল। এদিকে সরকার একে এক আন্দোলনকারী নেতাদিগকে কাহাকেও জেলে, কাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে, কাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া দিতে লাগিল। হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী একেবারে দমিয়া গেল। আন্দোলন থামিয়া গেল সরোজ একভাবেই কাজ চালাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে বেশী দিন এ ভাবেও কাজ করিতে হইল না। আবদুল্লাপুরের এক সভায় দুইজন দেশীয় ইনস্‌পেক্টর সরোজকে গ্রেপ্তার করিল। সভাস্থ মুসলমানগণ বাধা দিতে যাইতেছিল সরোজের নিষেধে ক্ষান্ত হইল। হাজতে যাওয়ার পূর্ব্বে সরোজ বলিয়া গেল, "আইন অমান্য ক'রে কোন কাজ আমি করিনি তোমরা কোর্টে যাও! ইচ্ছা না হয় যেওনা। যার ইচ্ছা আমার মত কাজ ক'রে জেলে এস! এর প্রয়োজন আছে। পেটের জ্বালায় এক বেলা খেয়ে দিন কাটানোর চেয়ে দুবেলা পেট ভর্ত্তি ক'রে মোটা হ'তে পার্‌বে।"

আবদুল্লাপুরের সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া মোকদ্দমা রুজু করিল। সাত দিন হাজত খাটার পর বিচার হইল। উত্তেজনা পূর্ণ সঙ্গীত রচনা ও গ্রামে গ্রামে তাঁহা গান করিয়া সাধারণকে মাতাইয়া তোলার অভিযোগে রায় হইল তিন মাসের জেল।

জেলে যাইয়া সরোজ নীহারকে এক পত্র লিখিল,—

নীহার!

এত দিনে আমি আংশিকও কবি হইতে পারিয়াছি। আমার গানে

দেশ না হউক দুই চারি খানা গ্রাম ও মাতিয়াছে। কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা উৎপীড়ন বা কোন আইন ভঙ্গ করিয়া আমি জেলে আসি নাই। তোমার অনুরোধ আমি অক্ষয়ে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছি। আলীপুরের জেলে আছি বেশ। যে কাজে হাত দিয়াছি জেল তাহাতে অনেকবার খাটিতে হইবে। অভ্যাস থাকা ভাল। এই গুলি হইতেছে সিঁড়ি এ সব পার না হইতে পারিলে দেশের দুর্দ্দিন যাইবে না।

(৭)

"মাষ্টার মশাই!"

নীহারকে অপ্রত্যাশিত ভাবে জেলের মধ্যে দেখিয়া সরোজ বিস্ময়ে এক পদ হাটিয়া গেল।

নীহার আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিয়া সরোজের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সরোজ নীহারকে উঠাইয়া ডাকিল 'নীহার'!—

নীহার এমন দৃষ্টিতে সরোজের দিকে চাহিল যে তার কবিহৃদয় বহুদিন পরে একটা নূতন সুরে বাজিয়া উঠিতে চাহিল!

নীহার বলিল,—"মাষ্টার মশাই তোমায় যা বলিনি আজ তাই বল্‌ব!"

বিচলিত হইয়া সরোজ বলিল, "কি সব বল্‌ছ নীহার আমি শিক্ষক তুমি ছাত্রী!"

নীহার বলিয়া উঠিল,—"আর তুমি প্রভু আমি দাসী। তুমি এত দিন আমায় শিখিয়েছ স্কুলের লেখাপড়া নয় কাব্য আর বিশ্ব-প্রেম তা স্বামীও স্ত্রীকে শিখাতে পারে। তার দোহাই দিয়ে তুমি আমায় ঠেলে ফেলতে পারছ না। আমি বাপ মায়ের আদেশ নিয়ে এসেছি! আমায় তুমি সঙ্গিনী ক'রে নাও। দুজনে মিলে দেশের কাজ কর্‌ব—জেলে যেতে হয় দুজনেই যাব।"

সরোজ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া সরোজ বলিল, "না না তা হ'তে পারে না।"

নীহার আরও নিকট সরিয়া যাইয়া হাত ধরিয়া বলিল, "কেন? তুমি দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছ তার পুরস্কার, প্রিয়তম, আমার এই প্রাণ তোমার জীবন পথে উৎসাহ দাতা।"

———

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা

জাতীয় শিক্ষা সমস্যা লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মূলে কেবল মাত্র একটা কথা আছে। আমাদের দেশের জিনিষ দেশীয় ভাবে শিখিবার অধিকার আমাদের আছে কিনা? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ম্যাট্রিকুলেশনে বাঙ্গালাভাষাকে শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই বলিতেছেন, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অসমীচীনের কাজ করিয়াছেন, ইংরাজীকে ইতিমধ্যেই যে অল্পমানের আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশনে শিক্ষার যে Standard বা মাত্রা ছিল, তাহা ইহাতে সংকুচিত হইয়া গেল, ক্লাইব ষ্ট্রীট রাধাবাজার ও মুর্গীহাটার ব্যবসায়ীরা সস্তায় আর ইংরাজীনবীশ কেরাণী পাইবেনা, ইংরাজীর যে জ্ঞান থাকিলে কোনও রূপে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়—তাহাও আর সম্ভবপর হইবে না, কনের বাপেরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ বরের আর তেমন 'কদর' করিবে না,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন খিঁচুড়ী পাকাইয়া গেল! অবশ্য এই উক্তি গুলি রক্ষণশীল সম্প্রদায়গণের। যাঁহারা শিক্ষা—সমস্যার সম্বন্ধে ভাবুক, তাঁহাদের মত কিন্তু অন্ত প্রকার। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে বিদেশী ভাষার পঠন—পাঠকের কোনওরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়, এ কথা সর্ব্বদেশের শিক্ষাব্যবসায়িগণ একবাক্যেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় তরঙ্গাপসৃত পলিমাটীর ন্যায় শিশুর মনটী কোমল ও নমনীয় থাকে, তখন তাহাতে সেটুকু আঘাত পড়িবে, তাহাই রেখারূপে তাহাতে দাগ কাটিয়া যাইবে। সুতরাং কিশোর জীবনের এই অবস্থায় কিশোরের যাহা মাতৃভাষা, সে স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছে, তাহারই শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এ পর্য্যন্ত কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থাপকেরা অন্ত নীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। রূপার তোড়াটী কেহ যদি চরণালঙ্কার না করিয়া শিরোভূষণ করে, তবে লোকে সেটা যেমন উন্মাদকর দৃশ্য বলিয়া হাসিতে থাকিবে, আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া বিদেশীরা তেমনি শ্লেষের সহিত হাসে। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েরা যে কেন 'A—B—C—D'

চিনিতে আরম্ভ করে, তাহা "বরিশাল গ্যাণের" মতই অবোধ্য। দোটানা মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বাঙ্গালাও শেখা হয় না, ইংরাজীও শেখা হয় না। তাহারা যাহা শেখে, তাহা ভাষার ব্যভিচার। মোগল-পাঠানের যুগে বাঙ্গালী আরবী ও ফার্সী শিখিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে যদিও সে বাঙ্গালা ভাষা ভুলে নাই, তথাপি সে ভাষার পাবিত্র্য ও শুচিতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে বাঙ্গালীর যুগনির্দ্দেশক পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহে ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়া গিয়াছে। জীবনের যে সোপান পর্য্যন্ত শিশুদের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয় না, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাই শিক্ষা করা উচিত। তৎপরে যখন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইল, তখন সে স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে বিদেশী ভাষার আলোচনা ও চর্চ্চা করিলে তাহা অতি সহজেই আয়ত্ব করিয়া ফেলিবে। এই একই কারণে বাঙ্গলা শিশুদের পক্ষে বাল্যকাল হইতে 'হিন্দী' শিক্ষালাভ অত্যন্ত দুষ্পাঠ্য হইবে। বিদেশী প্রথার অনুকরণে 'কিণ্ডারগার্টেন' প্রণালী আমাদের শিশুজীবনে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বস্তু পরিচয় হয় না, তাহারা কেবল কতকগুলি বাঁধা বুলি টিয়াপাখীর মত শিখিয়া যায়। বস্তু পরিচয় হয় নাই বলিয়া পরিণত বয়সে তাহাদের ভাব পরিচয়ও হয় না, আশপাশের জিনিষ তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায়, চক্ষু থাকিতেও তাহারা একরূপ জন্মান্ধ হইয়া থাকে,— তাহার উপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গুরুভার যখন তাহাদের স্কন্ধে গিয়া পড়ে, তখন তাহারা রামপ্রসাদী সুরে গাহিয়া যায়—

'মা, আমায় ঘুরাবি কত—
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত।'

সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার মূলে এই যে 'মুস্কিল' আছে, আজ তাহার 'আসান' করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এই জাতীয় উন্মেষের প্রথম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া দেশের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন; এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যথেষ্ট উদারনীতি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ৺রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোগেশচন্দ্র রায়, ললিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ শিক্ষাপ্রদানে বাঙ্গালা ভাষাকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া-ছেন। অধ্যাপনার সময় কোন্ ভাষা ব্যবহার করা উচিত, তাহার সম্বন্ধে দুইটী মত আছে—

(ক) ভাষা শিক্ষার সময় সেই ভাষাকেই শিক্ষার যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার সময় ইংরাজীকেই যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করাই উচিত। অবশ্য যেখানে দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের অবতারণা হইবে, সেখানে মাতৃভাষারই সাহায্য লইতে হইবে।

(খ) ভাষাশিক্ষাব্যতীত অন্য সর্ব্বশাস্ত্রশিক্ষায় মাতৃভাষাকেই যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন রসায়ণশাস্ত্র, চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা, উদ্ভিদতত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপনা মাতৃভাষাতেই সুবোধ্য ও সুগম হইবে। এই সমস্ত কঠিন বিষয়ের ইংরাজীতে শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা অধ্যাপকগণের নোট সমূহ কণ্ঠস্থ করে। ইহাতে কোনো কালেই তাহারা মানুষ হইতে পারে না, তাহাদের জীবনতরী আর কখনো কূলে ভিড়ায় না,—গোষ্পদ প্রমাণ জলে আসিয়াই ডুবিয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের ফলে এই সমস্যাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষার যে সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আমরা সর্ব্বদাই স্বীকার করিব। অথচ জীবন গঠনের প্রারম্ভেই ইংরাজী ভাষারূপ দুর্ব্বহ ভার শিশুর উপর চাপাইলে, 'হাঁপ' ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনবায়ু নিঃসারিত হইয়া যাইবে। মধ্যযুগের ইয়োরোপ সাধনায়, তন্ত্রে, মন্ত্রে, ভাষায়, ভাষায়, 'ল্যাটিন্' হইয়া গিয়াছিল, ল্যাটিন্ ছাড়া অন্য ভাষা বিধর্ম্মীর পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু এত করিয়াও যখন বিভিন্ন জাতিয় ব্যক্তিত্ব স্ফূরণ হইল না, তখন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতি সমূহ স্ব স্ব ভাষার অনুশীলনে যত্নবান্ হইল। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষাই শিক্ষার বাহন স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। একটী ইংরাজী বালক ছেলে বেলায় ইংরাজী-ই শিক্ষা করিবে, কারণ ইহাই তাহার মাতৃভাষা। কিন্তু কোন স্বর্গীয় বিধানবলে বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালা ছাড়িয়া ইংরাজীর শরণ লইতে যায়? আর কোন্ নীতি-অনুসারেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদিন এই অসহ অনাচার সহ্য করিয়াছিলেন? তাই বর্ত্তমান সন্নীতির সমর্থন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট উদারতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মধ্যযুগের ইয়োরোপে যেমন ল্যাটিন্ ভাষা একটী মহাদেশ প্রসারী ভাষা ছিল, আজ বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষাও সেই স্থান লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক কারণ বশতঃ ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে যে কোনো মত প্রচারিত

হইলেও ইংরাজী ভাষার এই দেশব্যাপী সম্প্রসারণ কেহই এক আঘাতে নিরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। কারণ ভাষার ব্যাপকতা কোনো অস্থায়ী মত উপর নির্ভর করে না। উপর তলার বাবুরা মালীকে যতই কেন হুকুমজারে করুন না, নীচের বাগানের তরুণ গোলাপ কোরকটীর সহজ বিকাশ কিছুতেই তাঁরা প্রতিরোধ করিতে পারেন না।—তাহা অব্যর্থভাবে ফুটিবেই। অপর পক্ষে ইংরাজী ভাষাকে মর্ম্মের সিংহাসনে বসাইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে দেউড়ীর দরোয়ানী করিতে দেওয়াটা যে অপমানকর সে বিষয়ে কেহই আপত্তি করিবেন না অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়েও বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া দেশবাসীর শিক্ষালাভ বিষয়ে স্বাধীনতার পথ খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের উপযুক্ত বই নাই, অথচ বাঙ্গালায় শিক্ষা দিতে হইবে, এ কেমন কথা? কিন্তু কোনো দেশে কোনো যুগে আগে বই লিখিয়া পরে ভাষার যোগ্যতার সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত উঠে নাই। যে সব ভাষা আর কথিত ভাষার অবস্থায় নাই, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণ লিখিয়া তবে ভাষা শিক্ষা দিয়াছে। উদ্ভিদ-তত্ত্বসম্বন্ধে বাঙ্গালায় উপযুক্ত বই নাই,— কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় যদি এবিষয়টী শিক্ষা দেওয়া হয়, বাঙ্গালা ভাষায় যদি ছাত্রগণ এই বিষয়টী বুঝিতে শেখে, তাহা হইলে শীঘ্রই বিষয়টী বাঙ্গালা ভাষায় যে লিখিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনটীকে কি ধাতুতে গড়িতে হইবে, এখন তাহাই বিবেচ্য। মাটীর পুতুলে যতই কেন রং ফলানো যাক না, তাহারা মৃত্তিকা-ধর্ম্ম যেমন কখনো ঘোচেনা, তেমনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ইংরাজী ভাষায় বহুকৃতবিদ্য হইলেও ঘুচিবে না। আমাদের মন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম যখন কোনো কালেই ত্যাগ করিতে পারিবেনা, তখন এই ভাষার আশ্রয়ই আমাদের পরমার্থ। আজ বাঙ্গালায় ভাষার এই দৃঢ় সমর্থন করিয়া বিশ্ববিস্তালয় বিভিন্নমত-পন্থীদের মধ্যে একটী অনশ্বর সুবর্ণ-মিলন-সেতু বাঁধিয়া দিয়াছেন।

———

ডালি

অধিকার ও কর্ত্তব্য।

[Mazzinir Duties of Man হইতে]

অধিকারের কথা না বলিয়া কেন তোমাদিগকে কর্ত্তব্যের কথা বলিতেছি? এই দেশে,—যেখানে সকলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে সতত উদ্যত, যেখানে মানবের বহু অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত, যেখানে কেবলমাত্র দুঃখ তোমাদের প্রাপ্য, আর যাহা সুখ বলিয়া মানবসমাজে পরিজ্ঞাত তাহা অন্যের নির্দ্দিষ্ট—সেখানে আমি যুদ্ধের কথা জয়ের কাহিনী না গাহিয়া ত্যাগের কথা বলিতে চাই কেন? পার্থিব উন্নতির কথা বলিয়া ধর্ম্মের কথা শিক্ষার কথা নৈতিক উন্নতির কথা শোনাইতে ব্যস্ত কেন?

অধিক কথা বলিবার আগে এই প্রশ্নের উত্তরটাই বিশদ ভাবে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে আমি বাধ্য। * * * কেননা এই প্রশ্নই দুর্দ্দশা পীড়িত শ্রমজীবিগণের হৃদয়ে স্বতঃই উত্থিত হয়:—

"আমরা কায়িকপরিশ্রমের ক্রীতদাস—দরিদ্র এবং অসুখী। আমাদের নিকট পার্থিব উন্নতি, স্বাধীনতা ও সুখের কাহিনী কীর্ত্তন কর। বল, আমরা কি চিরদিনই যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য? আমাদের অদৃষ্টে কি কখন সুখ ভোগ ঘটিয়া উঠিবে না? * * * আমাদের কাছে মানবের অধিকারের কথা বল। বল কি উপায়ে আমরা সেই সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইব। শোনাও আমাদিগকে আমাদের শক্তি-কথা। প্রথমতঃ আমাদিগকে একটা সর্ব্ব স্বীকৃত সমাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব লাভ করিতে দাও; তাহার পর আমাদের নিকট কর্ত্তব্যের কথা উত্থাপন করিও।"

বহুশ্রমজীবী এইরূপ কথা বলিয়া থাকে, এইরূপ মতের অনুসরণ করে এবং এইরূপ চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট সভা সমিতিতে যোগদান করে। কিন্তু একটা কথা তাহারা বিস্মৃত হয় যে বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমজীবিগণের অবস্থার সামান্য মাত্রও উন্নতি হয় নাই।

রাজতন্ত্র-শাসনপ্রণালী বা জন্মগত আভিজাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইউরোপ বিগত পঞ্চাশ বৎসরে যাহা কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা মানবের অধিকার

ও স্বাধীনতার নামে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভূত সুখলাভের উপায় স্বরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাট ফরাসী-বিপ্লব ও তদনুকরণে অনুষ্ঠিত অন্যান্য পরবর্ত্তী বিপ্লবসমূহ মানবের অধিকার প্রচারের ফলস্বরূপে সংঘটিত হইয়াছে। এইসব বিপ্লববাদিগণের মূলমন্ত্র এই যে :—মানব সুখভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপন ক্ষমতানুরূপ যে কোন উপায়ে সুখের সন্ধান করিতে মানব অধিকারী। তাঁহার সুখলাভপ্রচেষ্টায় বাধা দিতে কাহারও অধিকার নাই। সুখলাভের পথে সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করিবার অধিকার মানবের আছে।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া, স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক দেশে যে স্বাধীনতা বহু বর্ষ ধরিয়া বিদ্যমান ছিল, কোন কোন দেশে এখনও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে কি দেশের অধিবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে? লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা কায়িক পরিশ্রমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে তাহারা কি সেই অঙ্গীকৃত আকাঙ্ক্ষিত সুখের কণামাত্রও লাভ করিয়াছে? না, সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হয় নাই। বরং অনেক দেশে তাহাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

* * * *

তথাপি বলিতে হইবে এই পঞ্চাশ বৎসরে সামাজিক ঐশ্বর্য্যের উপাদান ও সুখলাভের পার্থিব উপাদান সমূহ ক্রমশঃই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। * * * বাণিজ্যের প্রসার ও প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সর্ব্বত্র সত্বর ও নিরাপদ যাতায়াতের এই সংবাদ প্রেরণের সুবিধা হইয়াছে। * * * অন্য দিকে মানবের সহজাত অধিকারের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। * * * তবে কেন দেশবাসীর অবস্থা উন্নত হইতেছে না? তবে কেন উৎপন্ন দ্রব্য-জাতের উপভোগ সকল ব্যক্তির করায়ত্ত না হইয়া মাত্র কয়েকজনের হস্তগত হইতেছে? * * * তবে কেন শিল্প বাণিজ্য নবভাবে উজ্জীবিত হইয়াও সমগ্র মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিদান না হইয়া কতিপয় ব্যক্তির বিলাসোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছে।

যাঁহারা একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। মানুষ শিক্ষার ক্রীড়নক। তাহাদিগকে যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহাদের কার্য্যপ্রণালীও তদনুরূপ হইবে। বিপ্লববাদের

সহায়কগণ ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনপ্রার্থিগণ একাল পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য-প্রণালী একটিমাত্র ভাবের উপর—ব্যক্তিগত অধিকার বাদের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। এই সব বিপ্লবের দ্বারা যে স্বাধীনতা অর্পিত হইয়াছে তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—শিক্ষার স্বাধীনতা, ধর্ম্মবিলাসের স্বাধীনতা, ব্যবসায়ের স্বাধীনতা, সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্ব মানবের জন্ম স্বাধীনতা!

কিন্তু যাহারা এই সমস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাদের যদি তাহা অনুশীলন করিবার উপায় না থাকে তবে সে অধিকার লাভে ফল কি? যদি শিক্ষা হইতে উপকার লাভের সময় বা উপায় মানবের না থাকে তবে শিক্ষার স্বাধীনতার লাভ কি? বাণিজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের কি ফল যদি না থাকে মূলধন, না থাকে বাজারে "পসার"?

যে সমস্ত দেশে এই সব তথ্য প্রচারিত হইয়াছিল, সেখানকার সমাজে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই ভূমি, অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল আর অবশিষ্ট বিশাল জনসংঘের কিছুই ছিল না। তাহারা কায়িক পরিশ্রমে প্রাণধারণ করিত এবং জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত যে কোন মূল্যে আপনাদের পরিশ্রম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। যাহাদিগকে সমস্ত একটা না একটা কায়িক পরিশ্রমে জীবনক্ষেপ করিতে হইত, ক্ষুধাও অভাবের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে হইত তাহাদের আবার স্বাধীনতা কি? তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতা হয় উপহাস, নয় প্রবঞ্চনা!

এইরূপ ঘটনা নিবারণ করবার একমাত্র উপায় ছিল যদি উচ্চশ্রেণী স্বেচ্ছায় পরিশ্রমের জন্ম নির্দ্দিষ্ট সময় হ্রাস করিয়া পরিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতেন, বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, শ্রমজীবিগণের বস্ত্রাদি সকলের মধ্যে সুলভ করিতেন, সচ্চরিত্র কর্ম্মনিপুণ শ্রমজীবিগণকে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেন।

কিন্তু কেন তাঁহাদের এইরূপ করা উচিত ছিল। সুখই কি মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নহে? পার্থিব উন্নতিই কি সকলের একমাত্র বাঞ্ছনীয় নহে? তবে কেন তাহারা পরের জন্ম আপনাদের ভোগের মাত্র কমাইয়া দিবেন? ****** তাহারা যে এইরূপ উত্তর দিতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহারা এইরূপ উত্তরই প্রদান করিয়াছিল। সম্পন্ন অবস্থার ব্যক্তি দরিদ্রকে এই ভাবেই অবলোকন করিত এবং ইহাই ক্রমশঃ সমাজের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার ও

অবস্থা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যখনই একজনের অধিকারের সহিত অন্যের অধিকারের সংঘর্ষ ঘটিত তখনই ফল হইত সামরিক অবস্থা * * * এই নির্দ্দয় যাহার অর্থ ছিল, কূটবুদ্ধি ছিল, সে দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীনকে পিষ্ট করিয়া ফেলিত।

এই প্রকার সামরিক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত হইয়া মানব কেবল স্বার্থপরতা ও ঐহিক উন্নতির লালসায় শিক্ষিত হইতে ছিল। ধর্ম্মমতের স্বাধীনতায় ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ ধ্বংস হইয়াছিল, শিক্ষার স্বাধীনতায় নৈতিক যথেচ্ছাচার উদ্ভূত হইয়াছিল। মানবজাতির মধ্যে কোন সাধারণ বন্ধন না থাকায় ধর্ম্মবিশ্বাস ও জীবনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব, ভোগে অত্যাসক্তি ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আসক্তি হেতু সকলেই নিজ নিজ অভিমত পন্থায় অগ্রসর হইতে লাগিল, কেহই ভাবিল না যদি সেই পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া তাহাদেরই ভ্রাতৃগণের দেহ পদদলিত হইয়া যায়। আমরা ভ্রাতা শুধু নামে, প্রকৃতপক্ষে শত্রু।

অধিকারবাদকে ধন্যবাদ, তাহার কৃপায় আজ আমরা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি! অধিকার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যদি অধিকার বাদ অপেক্ষা উচ্চতর কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া না লই তবে যখন একের অধিকারের সহিত অন্য ব্যক্তির অধিকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন কেমন করিয়া আমরা সেই সংঘর্ষের মীমাংসা করিব?

যদি মানব মাত্রেরই সুখলাভে অধিকার থাকে তবে শ্রমজীবী ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে সমস্যাসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা কেমন করিয়া তাহাদের মীমাংসা করিব? যদি প্রাণরক্ষা মানব মাত্রেরই অলঙ্ঘ্য অধিকার হয় তবে পরের উপকারের জন্য সেই প্রাণপাত করিতে কে উপদেশ দিবে? দেশের নামে, জনসংঘের নামে তোমরা তাহা চাহিতে পার কি?

* * * *

তোমরা যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ব্যক্তিকে বলিয়া আসিতেছ, সমাজ তাহারই অধিকারসমূহের নিরাপদ অনুশীলনের জন্য গঠিত হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে যে সমাজের জন্য সর্ব্বস্ব তাহার উৎসর্গ করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে সমাজের উন্নতির জন্য তাহাকে অনন্ত দুঃখ, কারাবাস এমন কি নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে? তোমরা সাধ্যমত তাহাকে শিক্ষা

দিয়াছ যে সুখ ভোগই মানব জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য; তবে কেমন করিয়া আশা করিতে পার যে বিদেশীয় অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার জন্য অথবা তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহের অবস্থার উন্নতির জন্য সেই সুখ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সে সম্মত হইবে? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাহার নিকট পার্থিব স্বার্থের মন্ত্র প্রচার করিবার পর কেমন করিয়া তোমরা আশা করিতে পার যে তাহার স্বদেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এই ভাবিয়া ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা আয়ত্বের মধ্যে পাইয়াও সে তৎসমুদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে না?

শ্রমজীবিগণ, ইহা কেবলমাত্র আসার মনঃকল্পিত, ঘটনার দ্বারা অপ্রমাণিত ব্যক্তিগত মত নহে। ইহা ইতিহাস—আমাদের বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস—যাহার প্রতিপৃষ্ঠা দেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত।

• • • •

আমরা যে পবিত্র সামাজিক যুদ্ধে নিরত, ইহাকে যদি কেবলমাত্র অধিকার লাভের যুদ্ধে পরিণত করা যায়, তবে যেদেশের অধিবাসিগণ পূর্ণ দাসত্বে শৃঙ্খলিত যেখানে এইরূপ সময়ে আরও বহু বিপদের সম্ভাবনা, যেখানে উন্নতির প্রতি পাদক্ষেপ স্বদেশপ্রেমিকের রক্তে অনুরঞ্জিত, যেখানে শাসকদিগের বিরুদ্ধে এই সময় গুপ্ত, প্রকাশ্য আন্দোলনের সান্ত্বনা ও প্রশংসায় বঞ্চিত, সেখানকার নেতৃগণ কোন্ দায়িত্বজ্ঞানে, কোন্ বিশ্বাসের প্রেরণায় উন্নতিলাভের পন্থায় অটল থাকিতে পারে? • • •

রক্তের উত্তেজনায়, অত্যাচারের প্রতিশোধ কামনায় যুবকগণ সহজেই এইরূপ সময়ে যোগদান করিতে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন তাহার অবসান হয়, এইপ্রকার প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যখন মোহঘোর কাটিয়া যায়, তখন কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের পর, কেন তাহারা সেই অশান্তিময়, বিঘ্ন-সঙ্কুল, বিপদ্ পরিপূর্ণ জীবন—যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে কারাবাস, বধমঞ্চ বা নির্ব্বাসনে নির্দ্ধাপিত হইতে পারে এইরূপ জীবনের পরিবর্ত্তে আরামময় জীবন অবলম্বন না করিবে? •

• • • এরূপ কাহিনী বড়ই করুণ, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, এই সব মন্ত্রেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না কি? কেমন করিয়া, কাহার দোহাই দিয়া আমরা লোকের বিশ্বাস জন্মাইব যে বিপদ ও প্রবঞ্চনা

তাহাদিগকে নিরুৎসাহ না করিয়া বরং অধিকতর শক্তিমান করিবে; যে এই যুদ্ধ তাহাদিগকে কয়েক বৎসরের জন্য নহে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া চালাইতে হইবে। কেবলমাত্র অধিকার লাভের জন্য কে তাহাদিগকে এইরূপ যুদ্ধে ব্রতী হইতে উপদেশ দিবে যখন দেখা যাইতেছে যে অধিকারবর্জ্জন অপেক্ষা এই যুদ্ধে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ অধিকতর?

* * * অধিকারবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কে বুঝাইবে যে সাধারণের হিতের জন্য চেষ্টা ও সামাজিক ভাবের বিকাশের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে সে বাধ্য? ধর, সে যদি বিদ্রোহী হয়, সে যদি সাহস করিয়া তোমাদিগকে বলে, "আমি সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতেছি। আমার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি আমাকে অন্যত্র আকৃষ্ট করিতেছে। সেই ইচ্ছা ও সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আমার অলঙ্ঘ্য, অধিকার আছে সেজন্য আমি সকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অভিলাষী" তখন অধিকারবাদের চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমরা কি তাহার কথার উত্তর প্রদান করিতে পার? কেবল বহুসংখ্যক ব্যক্তি তোমাদের দলভুক্ত বলিয়া তোমরা কোন্ অধিকারে তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করাইতে পার? আর সেই নিয়ম যদি সে ভঙ্গ করে তবে তাহাকে শাস্তি দিবার কোন অধিকার তোমাদের আছে কি?

প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার সমান। কেবলমাত্র এক সমাজে একত্র অবস্থান করে বলিয়া কোন অধিকার জন্মিতে পারে না। ব্যক্তির অপেক্ষা সমষ্টির ক্ষমতা অধিক হইতে পারে কিন্তু অধিকার বেশী নয়। তবে কেমন করিয়া তোমরা ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে তাহার স্বদেশী অথবা বিদেশী ভ্রাতৃগণের ইচ্ছার নিকট তাহার ইচ্ছাকে নত করিতে হইবে?

কারাবাস বা ঘাতকের ভয় দেখাইয়া?

যে সমস্ত সমাজ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারা সকলেই এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

কিন্তু ইহা ত দ্বন্দ্বের কথা—আমরা চাহি শান্তি। ইহা অত্যাচার-উৎপীড়ন, আমরা চাহি শিক্ষা।

বলিয়াছি আমরা চাহি শিক্ষা। এই এক কথার উপর আমার সমস্ত মতবাদ স্থাপিত, আমার সমস্ত বক্তব্য পঞ্জীভূত। বর্ত্তমান কালের আন্দোলনে শিক্ষাই প্রধান সমস্যা। আমরা বলপ্রয়োগের সাহায্যে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন

করিতে চাহি না। যতই উৎকৃষ্ট হউক না বলপ্রয়োগে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন করার নাম উৎপীড়ন। আমরা যাহা করিতে পারি তাহা এইমাত্র :—বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়মের অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর বিধান আমরা জাতির সম্মতির জন্য প্রস্তাব করিতে পারি এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে পারি যে সাধ্যমত, সর্ব্ববিধ উপায়ে উক্ত নিয়ম অবলম্বন ও তদনুসারে কার্য্য করা তাদের কর্ত্তব্য।

উৎপীড়ন মানবের উন্নতিপন্থায় যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন নিক্ষেপ করে তাহা অপসারিত করিবার জন্য অধিকারপদ মানবকে উৎসাহিত করিতে সমর্থ তাহা স্বীকার করি কিন্তু যেখানে মানবের উদ্দেশ্য—যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান লইয়া সমাজ গঠিত তাহাদের মধ্যে একটা মহান্ ও শক্তিশালী সামঞ্জস্য সংগঠিত করা, সেখানে অধিকারবাদ নিষ্ফল। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সুখলাভ-এই মতবাদ প্রচার করিয়া আমরা কেবল কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তির সৃষ্টি করিব যাহারা তাহাদের পুরাতন প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা নূতন নিয়মের মধ্যে টানিয়া আনিয়া মাস কয়েকের মধ্যেই তাহাকে পঙ্কিল করিয়া তুলিবে। সেইজন্য আমাদিগকে এমন একটা নীতির সন্ধান করিতে হইবে যাহা পূর্ব্বোক্ত মতবাদ সমূহ হইতে মহত্তর হইবে এবং যাহা মানব জাতিকে উন্নতিরপথে পরিচালিত করিবে, তাহাদিগকে বিশ্বস্ততা ও আত্মত্যাগশিক্ষা দিবে, ব্যক্তি বিশেষ অথবা বহুর প্রভাব হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিয়া তাহাদের মধ্যে একতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। এই নীতির নাম কর্ত্তব্য। আমরা মানবকে শিক্ষা দিব যে সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান। এই জগতে কেবলমাত্র একটী বিধান মানিয়া চলিতে মানব বাধ্য। প্রত্যেককে নিজের জন্য নহে,পরের জন্য জীবন ধারণ করিতে হইবে। অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখী হওয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে; তাহার উদ্দেশ্য আপনাকে এবং অপরকে অধিকতর পুণ্যবান্ করা। স্ব স্ব ভ্রাতৃগণের নামে ও সাহায্যে অন্যায় ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কেবল মাত্র একটা অধিকার নহে তাহা কর্ত্তব্য—সমস্ত জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—যাহার অবহেলা পাপ।

ভ্রাতৃগণ, আমার বাক্য বিশেষ করিয়া প্রনিধান কর। তোমাদের অধিকার জ্ঞান কোন কালেই তোমাদিগকে স্থায়ী ও মূল্যবান উন্নতি প্রদান করিতে পারিবে না ইহা বলিয়া আমি তোমাদিগকে অধিকার সমূহ বর্জ্জন করিতে বলিতেছি না। আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে অধিকার লাভ কর্ত্তব্য পালনের পরিণাম স্বরূপেই সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং অধিকার

সমূহ আয়ত্ব করিতে হইলে আমাদিগকে কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা করিতে হইবে। আমি যে বলিয়াছি সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, পার্থিব উন্নতিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা স্বার্থপর হইব ইহাতে এমন বুঝিওনা যে উক্ত সব বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি আমি বলিতে চাহি যে কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য হইলে তাহার ফল অতি, বিষময় ও সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে।

* * * *

পার্থিব উন্নতিও প্রয়োজনীয় এবং আমরাও তাহা পাইতে চেষ্টা করিব তবে তাহার কারণ ইহা নহে যে মানব মাত্রেরই সুন্দর বাসস্থান ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনীয়; তাহার কারণ যতদিন মানব বর্ত্তমান যুগের ন্যায় দারিদ্র্য ও অভাবের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতে থাকিবে ততদিন তাহাদের হৃদয়ে মহত্ব জ্ঞান ও নৈতিক উন্নতির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে না।

* * * *

সুতরাং তোমাদের নৈতিক উন্নতির জন্য তোমাদের অবস্থার উন্নতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহাদিগকে উপায় স্বরূপে গ্রহণ করিও; জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিও না। কর্ত্তব্য জ্ঞানের দিক হইতে তাহাদের সন্ধান করিও, অধিকার বলিয়া দাবী করিও না। ঐহিক সুখলাভের আশা না করিয়া পুণ্যলাভ প্রয়াসে তাহাদের জন্য চেষ্টা করিও। তাহা না হইলে তোমাদের অত্যাচারিগণের ও তোমাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? অত্যাচারী-গণও কেবল স্ব স্ব সুখ, ভোগ ও ক্ষমতার লালসায় উৎপীড়ন করিয়া থাক।

আপনাদিগকে উন্নত কর। ইহাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে। কেবল মাত্র আত্মোন্নতির বলে, পুণ্যের প্রভাবে তোমরা স্ব স্ব অবস্থাকে অল্প অসুখী করিতে পারিবে। ঐহিক স্বার্থ বা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানের দ্বারা উন্নতির কামনা করিলে তোমাদের মধ্যেই সহস্র সহস্র অত্যাচারীর সৃষ্টি হইবে। যতদিন তোমরা স্বার্থপর ও বর্ত্তমান প্রবৃত্তি সমূহের দাস থাকিবে ততদিন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করিলেও কোন উপকার সাধিত হইবে না।

যাহারা এখনও তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছে তাহাদেরও উন্নতি

সাধন আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু আপনাদিগকে উন্নত করা ব্যতীত তোমরা সে চেষ্টায় সফল হইবে না।

* * * *

ইহার সংশাধন করা বিশ্বাসের কার্য্য। বিশ্বাস করিতে হইবে এই পৃথিবীতে পরমেশ্বর তাহার মানব সন্তানগণের উপর কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে হইবে, যে সে কর্ত্তব্য পালন না করিলে তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হইবে সত্যের জন্ম অবিরাম চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য।

* * * *

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—ভগবান তাঁহার সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে যে স্বাধীনতা ও ক্রমোন্নতির বীজ প্রদান করিয়াছেন তাহাকেই পূর্ণভাবে বিকশিত করা। স্বর্গে যেরূপ ভগবদ্রাজ্য বিদ্যমান মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ রাজ্যের অস্তিত্ব আমরা কামনা করি। পৃথিবী যেন স্বর্গলাভের হেতু ভূত হয়। সমাজ যেন ঐশ্বরিক ভাবের ক্রমোপলব্ধি প্রচেষ্টা ক্ষেত্র হয়। খৃষ্ট যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকার্য্য সেই ধর্ম্মমতের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সব প্রচারকগণ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিকার্য্য তাঁহাদের গৃহীত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি জীবন্ত ছিল। তোমরাও তদ্রূপ হও, তোমরা জয়লাভ করিবে। যাহারা তোমাদের উচ্চে অবস্থিত তাঁহাদের নিকট কর্ত্তব্যের প্রচার কর আর সাধ্যমত স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন কর। ধর্ম্ম, প্রেম ও আত্মোৎসর্গ প্রচার কর। নিজেরা ধার্ম্মিক, প্রেমিক ও আত্মোৎসর্গপরায়ণ হও। স্ব স্ব মনোভাব সাহস করিয়া প্রকাশ কর, সাহস করিয়া আপনাদের অভাব ব্যক্ত কর; কিন্তু ক্রোধ করিও না; ভীতি প্রদর্শন করিও না, প্রতিশোধ কামনা করিও না। যদি কোন ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন আবশ্যক হয়, মনে রাখিও বাক্যজালা অপেক্ষা দৃঢ়তা অধিকতর ভীতিপ্রদ।

তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই সুখময় ভবিষ্যতের কথা প্রচার করিও, তাহাতে তাহারা শিক্ষা, কর্ম্ম ও তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করিবে। তাহাদিগকে মানবের কর্ত্তব্য ও বিবেক সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করিও এবং

সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকেও উন্নত ও শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করি ও; তোমাদের কর্ত্তব্যের পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও তদনুশীলন জন্য আপনাদিগকে সতত প্রস্তুত রাখিও।

নারায়ণের নিকষমণি

বিপথ।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ১৷৹ টাকা, বড় বড় সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়। বইখানি পারিবারিক উপন্যাস, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বই পড়ে মনে হয় যে একটি সরলা বালিকা 'চারু' সরল মনে একটা খেয়ালের বশে একটা সেবার পথ ধরেছিল। কিন্তু সে পথ হয়েছিল তার পক্ষে বিপথ, সুতরাং পথভোলা মেয়েটি একটা মস্ত ভ্রান্তি নিয়ে শেষে মরণের কোলে শান্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। "চারুর" চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে গ্রন্থকার সফল হয়েছেন এবং এটা ফোটাবার জন্যই বাকী চরিত্রগুলির সৃষ্টি; তাদের নিজেদের তত কিছু বিশেষত্ব নেই। সুতরাং সে সব চরিত্রের দুই এক জায়গায় গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হ'তে না পারলেও আসল চরিত্রের তাতে বড় যায় আসে না। মোটের উপর প্রতি পাদক্ষেপে চারুর পথভ্রান্তিটা ফুটিয়ে তুলতে লেখক মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতার বেশ পরিচয় দিয়েছেন; কেবল চারু ও বিজয়ের মিলনটা কতকটা dramatic হয়ে পড়েছে। বিজয়ের পিতা শশীভূষণের চরিত্রে ধারাবাহিক ভাবে একটা রুক্ষতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে লেখক মহাশয় অনেকটা সফল হয়েছেন, কেবল মাঝখানে বর্ণনাটা একটু বেমানানসই হয়েছে। এই রুক্ষ প্রকৃতিকে জয় করে চারু যে তাতে করুণ স্নেহের রস বহিয়েছিল, এটাই হচ্চে গ্রন্থকারের চারুর চরিত্র ফোটানের দিক দিয়ে খুব বড় কৃতিত্ব। নিরেট আহাম্মক দীননাথের চরিত্রে গ্রাম্যতা একটু বেশী মাত্রায় দেখা দিলে ও আসলে সেটা উপভোগ্য হয়েছে। লেখকের এটা প্রথম রচনা, সুতরাং তাতে ভ্রম প্রমাদ অনেক আছে এবং তা থাকা স্বভাবিকও। যেমন সত্যদা'র ও মোক্ষদার চরিত্র আদৌ ফোটেনি। তবে একথা আমরা বলতে বাধ্য প্রথম চেষ্টা হিসাবে গ্রন্থকার আমাদের প্রশংসা ও উৎসাহের দাবী করতে পারেন। বইখানাতে ছখানা সুন্দর ছবি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে সময়োচিত ভাবপ্রকাশ ও মানসিক অবস্থা বোঝাবার বেশ প্রয়াস হয়েছে। লেখকের বর্ণনার ভাষা ভাল, বাঁধাই সুন্দর; সুতরাং সে হিসাবে দাম অল্প। পূজার অবকাশে বইখানি পড়ে পাঠকেরা নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাবেন।

নারায়ণ

সম্পাদক—
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

ভাদ্র,
১৩২৯

সহকারী সম্পাদক—
শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ